ইস্টবেঙ্গল সমাচার

শারদ সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩ ■ দাম - ৫০ (পঞ্চাশ টাকা)

জয় ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটে শ্রাচিগ্রুপ

নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের স্পনসর শ্রাচিগ্রুপ। ঘোষণা মঞ্চে রয়েছেন কর্ণধার রাহুল টোডি। রয়েছেন ৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাটিল, প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়িকা ঝুলন গোস্বামী, বাংলার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিএবির বর্তমান ও প্রাক্তন সভাপতি স্নেহাশিষ গাঙ্গুলী, অভিষেক ডালমিয়া, সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান গেমস জয়ী ভারতীয় মহিলাদলের বোলিং কোচ রাজীব দত্ত। এছাড়া রয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত ও সচিব কল্যাণ মজুমদার।

সন্দীপ পাটিলকে সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত। রয়েছেন সিএবির সভাপতি স্নেহাশিষ গাঙ্গুলি, শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি।

ইস্টবেঙ্গল সচিব কল্যাণ মজুমদারের হাতে চুক্তিপত্রের কাগজ তুলে দিচ্ছেন শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি। রয়েছেন সহসচিব রূপক সাহা, কার্যকরি কমিটির সদস্য সুমন দাশগুপ্ত।

সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান গেমস মহিলা ক্রিকেটে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের বোলিং কোচ রাজীব দত্তকে সংবর্ধিত করছেন কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার। মাঝে শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি।

প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়িকা ঝুলন গোস্বামীকে সংবর্ধিত করছেন বাংলা রঞ্জি দলের প্রাক্তন দুই ক্রিকেটার শরদিন্দু মুখার্জি, রণদেব বসু।

সূচি

জয় ইস্টবেঙ্গল

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩

অরূপ পাল : ইস্টবেঙ্গলের ১০৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মিলে গেল দুই বাংলা ২-৪

সমাচার প্রতিবেদন : ১৩ আগস্ট ক্রীড়া দিবস ৫

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি ৬

সুমিত ঘোষ : বড় ম্যাচের বড়ে মিঞা ৭-৯

গৌতম ভট্টাচার্য : আন্ডারডগের আল্লা ১০-১১

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্মরণীয় মুহূর্ত ১২-১৩

বিপ্লব দাশগুপ্ত : লাল-হলুদ জার্সি অদৃশ্য শক্তি ভর করত : মহম্মদ হাবিব ১৪-১৫

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় : সদ্যপ্রয়াত 'ইস্টবেঙ্গল গৌরব' মহম্মদ হাবিব ১৬-১৭

সমাচার প্রতিবেদন : হাবিবকে নিয়ে প্রাক্তনদের প্রতিক্রিয়া ১৮

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণ যুগের ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানি প্রয়াত ১৯

সমাচার প্রতিবেদন : ৯০-এর দ্বিতীয়বার ত্রিমুকুট জয়ী ইস্টবেঙ্গল ফুটবল সচিবকে স্মরণ : দেবব্রত সরকার ২০

শ্রদ্ধায় স্মরণে : ২১

সমাচার প্রতিবেদন : ২০২২-২০২৩ ইস্টবেঙ্গলের বার্ষিক সাধারণসভা ২২

সমাচার প্রতিবেদন : ফের ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের মানবিকতার নজির ২২

অনীক চক্রবর্তী : কুয়াদ্রাতের জাদুতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার মোহনবাগানের ২৩

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটের উন্নতি লক্ষ্য শ্রাচি গ্রুপের ২৪

ভারতের সর্বোচ্চ পদক জয় ১০৭টি ২৫

টিঙ্কু দে : ট্যাকল করতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শরণাপন্ন ২৬

সমাচার প্রতিবেদন : স্কুল ক্রিকেট ২৭

শারদ শুভেচ্ছা

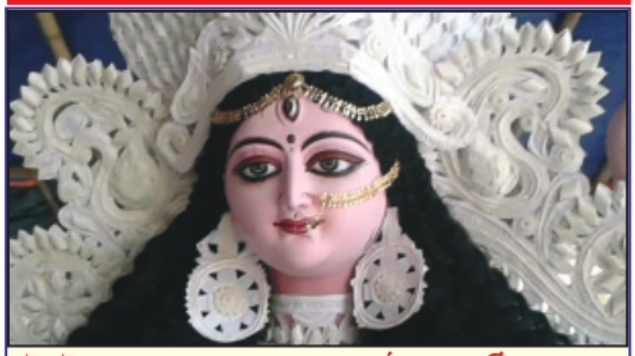

ইস্টবেঙ্গল সমাচারের পাঠক-পাঠিকাদের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন দাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবকিছু ভুলে পুজোর দিনগুলো সবার আনন্দে কাটুক।

সম্পাদকীয়

ছিঃ

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রবিবার, শহর কলকাতা দখল নিয়েছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। ছিল না কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিল কিংবা মিটিং। বরং রাজনৈতিক শ্লোগান ভুলে উঠেছিল ওই ছেলেটা ইস্টবেঙ্গল, ওই মেয়েটা মোহনবাগান। সঙ্গে সাউন্ড বক্সে বেজে ওঠা প্রিয় দলের থিম সং জানান দিচ্ছিল আজ ডার্বি ম্যাচ। বাঙালির দু'ভাগে ভাগ হওয়ার দিন। আট থেকে আশি সবাই সেদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনমুখী। হ্যাঁ, এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিলই। কিন্তু তারপর ... হ্যাঁ, তারপর মানে ডার্বি ম্যাচ শেষে যা ঘটল, তা শুধু ফুটবল নামক খেলাটিকে আঘাত করেনি, আঘাতের পাশাপাশি কলুষিত হয়েছে গোটা বাঙালির প্রিয় খেলা ফুটবল। দুই প্রধানের লড়াই মানে বাঙালির গর্বের লড়াই। বলা যায় বাঙালির অহঙ্কার, আত্মমর্যাদার লড়াই। সেই লড়াইকে কেন্দ্র করে রবিবাসরীয় ম্যাচের শেষে পড়শি পাড়া ক্লাবের সমর্থকদের আচরণ এককথায় ভাবা যায় না। ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাড়ি ফেরার পথে পড়শি পাড়া ক্লাবের সমর্থকরা আক্রমণ করলেন লাল-হলুদ সমর্থকদের। শুধু পুরুষ সমর্থকরা নন, শারীরিক আঘাত থেকে বাদ পড়েননি মহিলারাও। যা দেখে ব্যথিত ফুটবল মহল। শারীরিক আক্রমণের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা পা দিয়ে মাড়ানো, এমন কি জার্সিও ছিঁড়ে দিয়েছেন পড়শিপাড়া ক্লাবের সমর্থকরা। এই ঘৃণ্য আচরণ ফুটবলকে যারা ভালোবাসে তারা করতে পারেন না। তাই ডার্বি ম্যাচের শেষে পড়শি পাড়া ক্লাবের যে সমস্ত সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন তাদের জন্য একটি শব্দই প্রযোজ্য। সেটা হল ছিঃ। শুধু এবারই নয়, ডার্বি ম্যাচে জয় পেলেই যুবভারতী সংলগ্ন পড়শি পাড়া ক্লাবের সমর্থকদের দাদাগিরি বহুগুণ বেড়ে যায়। যারা এই নোংরা খেলায় মেতে ওঠেন তাদেরকে জানাই ধিক্কার। খেলায় হারজিৎ আছেই, তা বলে এই আচরণ কখনই মেনে নেওয়া যায় না।

যাক সে সব কথা। সামনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। এই পুজো সকলের মুখে হাসি ফোটায়। এই কয়েকটা দিন বাঙালি সব দুঃখ কষ্ট ভুলে আনন্দে মেতে ওঠেন। দুর্গাপুজো হল একতার উৎসব। দুর্গাপুজোকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এবারও বাঙালি ফের মেতে উঠবে। আনন্দে মেতে ওঠার প্রহর গোণা শুরু আপামর বাঙালির। আগাম শুভেচ্ছা রইল সমস্ত বাঙালির জন্য।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি

বর্তমানে আর্ট পেপারের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলাম। তাই ১০ টাকার পরিবর্তে জুন মাস থেকে ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম ৫০ টাকা করা হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল লাইব্রেরি ও আর্কাইভ খোলা থাকবে প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ। মেম্বারর্স লাউন্স খোলার সময় দুপুর ১২টা। প্রতিদিন খোলা থাকবে সবার জন্য।

ইস্টবেঙ্গলের ১০৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মিলে গেল দুই বাংলা

অরূপ পাল, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

১০৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ওপার বাংলার ফুটবলার আসলাম, ঘাউস এর পাশাপাশি প্রয়াত মুন্নার সহধর্মিনীর ইয়াসমিন মোনেম সুরভির সঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন প্রাক্তন দুই ফুটবলার শিশির ঘোষ, কার্তিক শেঠ ও প্রয়াত মুন্নার ছেলে আনসাজান সালিদ ।

পায়ে পায়ে ১০৪ বছরে পা রাখল ইস্টবেঙ্গল। তাই প্রতিবারের মতো এবারও পয়লা আগস্ট সকাল থেকেই লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে অবস্থিত ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে ছিল সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়। বেশিরভাগ সমর্থকদের গায়ে লাল-হলুদ জার্সি। মুখে জয় ইস্টবেঙ্গল স্লোগান। অধিকাংশ সদস্য, সমর্থকদের মোবাইলে বাজছে অরিজিৎ সিং'র জনপ্রিয় গাওয়া সেই গান 'একশো বছর ধরে মাঠ কাঁপাচ্ছে যে দল। সবাই সারিবদ্ধভাবে প্রিয় ক্লাবে ঢুকছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৪ বছরের প্রতিষ্ঠা দিবসের সাক্ষী থাকতে। স্ব-মহিমায় প্রিয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হচ্ছে বলে বেজায় খুশি আট থেকে আশি লাল-হলুদ সমর্থকরা। ঠিক সকাল সাড়ে এগারোটায় পতাকা উত্তোলন করে ১০৪তম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভ সূচনা করেন লাল-হলুদের প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলি, তরুণ দে, বিকাশ পাঁজি, মিহির বসু, বাংলাদেশ আবাহনী ক্রীড়া চক্রের দুই প্রাক্তন ফুটবলার আসলাম খান এবং মহম্মদ ঘাউস। পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি কেক কাটার অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রাক্তন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুরেশচন্দ্র চৌধুরীর ছবিতে মাল্যদান করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানেও ছিল চাঁদের হাট। উচ্ছ্বাস, আবেগের সমাহারে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ইস্টবেঙ্গল প্রতিষ্ঠা দিবসে হাজির ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সচিব স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ। এ ছাড়া ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা মঞ্চে হাজির ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক তাপস রায়, শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব, ডিটিডিসি-র কর্ণধার শুভাশীষ চক্রবর্ত্তী, বন্ধন ব্যাঙ্কের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ। ছিলেন শ্যাম থাপা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলি সহ এক ঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলারদের পাশাপাশি আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, ইনভেস্টার ইমামির দুই কর্তা দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিভাস আগরওয়াল। প্রতিষ্ঠা দিবসে মঞ্চে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র ও জুনিয়র দলের ফুটবলারদের পাশাপাশি দুই কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত এবং বিনো জর্জ। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সচিব সাজি প্রভাকরণ, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ, ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস, পড়শি পাড়া ক্লাবের ফুটবল সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠা দিবসের সন্ধ্যায় 'ভারত গৌরব সম্মানে' সম্মানিত করা হয় টাটা সন্স-র চেয়ারম্যান শ্রী রতন টাটাকে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য রতন টাটা অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারেননি। তাই 'ভারত গৌরব' সম্মান পুরস্কার পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁর বাড়িতে।

ব্যোমকেশ বোস মেমোরিয়াল 'জীবনকৃতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয় প্রাক্তন গোলরক্ষক তরুণ বসুকে। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলি। জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত হয়ে আপ্লুত প্রাক্তন গোলরক্ষক তরুণ বসু। তিনি বলেন, ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যে আজও আমাকে মনে রেখেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই পুরস্কার আমার জীবনে সেরা পুরস্কার। তরুণের উত্তরসূরি ভাস্কর বলেন, ৭৫ সালে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৫-০ গোলে জয় পেয়েছিল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে।

অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে সংবর্ধিত করছেন ক্লাবের কার্যকরি কমিটির সদস্য ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল সহসচিব রূপক সাহা ও ইস্টবেঙ্গল সহসভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী।

দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল সহসচিব রূপক সাহা ও ইস্টবেঙ্গল সহসভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী।

প্রাক্তন ফুটবলার তরুণ বসুর হাতে 'জীবনকৃতি' সম্মান তুলে দিচ্ছেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। পাশে সচিব সাজি, প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলি, সহসচিব রূপক সাহা।

প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্যকে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করছেন সিএবির সভাপতি স্নেহাশিষ গাঙ্গুলি। রয়েছেন সংগীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য, প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষিয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক অরুণ সেনগুপ্তকে সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন দুই ফুটবলার শ্যাম থাপা, সমরেশ চৌধুরী। রয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সচিব স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ।

সেই ম্যাচে পাঁচ গোলের মধ্যে আমি চার গোল হজম করেছিলাম। সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমাকে তুলে এনেছিলেন তরুণ দা। নিজে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ওঁর অবদান কখনও ভোলার নয়। ডা. রমেশচন্দ্র (নসা) সেন মেমোরিয়াল জীবনস্মৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয় প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক অরূপ ভট্টাচার্যকে। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়। জীবনকৃতি সম্মান পেয়ে অরূপ ভট্টাচার্য বলেন, জীবনে বহু পুরস্কার পেলেও নিজের প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল থেকে পুরস্কার পাওয়াটা বিরাট সম্মানের। জীবনের সেরা পুরস্কার এটাই। গোপাল বসু মেমোরিয়াল পুরস্কার পান সেরা ক্রিকেটার অঙ্কুর পাল। সেরা দুই লাল-হলুদ সমর্থককেও সম্মানিত করলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

সেরা উদীয়মান ফুটবলার নাওরেম মহেশ সিংকে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাদ।

দৃষ্টিহীন প্রদীপ দাস, যিনি গত ৩০ বছর ধরে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে হাজির থেকেছেন। অন্য জন হলেন ক্যান্সারে আক্রান্ত সমর্থক সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অজয় বসু মেমোরিয়াল সাংবাদিক সম্মানে সম্মানিত করা হল অরুণ সেনগুপ্তকে। পুষ্পেন সরকার মেমোরিয়াল সাংবাদিক সম্মানে সম্মানিত হলেন ধারাভাষ্যকার প্রদীপ রায়। প্রতুল চক্রবর্ত্তী মেমোরিয়াল রেফারি সম্মানে সম্মানিত হলেন অরুণাভ দাস। পঙ্কজ গুপ্ত মেমোরিয়াল রেফারি সম্মানে সম্মানিত করা হল মেহবুব হোসেনকে। বর্ষসেরা ফুটবলার ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভা হাজির না থাকলেও হাজির ছিলেন সেরা উদীয়মান ফুটবলার মহেশ সিং নাওরেম। মহেশের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। ১০৪তম ইস্টবেঙ্গল

দৃষ্টিহীন লাল-হলুদের সেরা সমর্থক প্রদীপ দাসকে সংবর্ধিত করছেন সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও ক্লাবের সহ সচিব রূপক সাহা।

লাল-হলুদের সেরা সমর্থক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক ও পরিষদীয় মন্ত্রী তাপস রায় ও সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক।

প্রতিষ্ঠা দিবসে এবার মিলে গেল এপার বাংলা ওপার বাংলা। এবার বাংলার ফুটবলারদের মতো সংবর্ধিত করা হল ওপার বাংলার ফুটবলারদেরও। বাংলাদেশের প্রয়াত ফুটবলার মোনেম মুন্নার স্ত্রী ইয়াসমিন মোনেম সুরভি ও ছেলে আনজাহান সালিদের হাতে 'আত্মজন স্মৃতি' পুরস্কার তুলে দেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। 'আত্মজন প্রীতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয় ওপার বাংলার তিন ফুটবলার রুমি রিজভীকরিম আসলাম এবং মহম্মদ ঘাউসকেও। উল্লেখ্য বাংলাদেশের আবহনী ক্রীড়াচক্র থেকে এপার বাংলার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে প্রয়াত সচিব পল্টু দাসের হাত ধরে খেলতে এসেছিলেন মুন্না, আসলাম এবং ঘাউস। 'আত্মজন প্রীতি' সম্মানে সম্মানিত করা হয় বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মেহরিন মাহমুদ এবং প্রাক্তন আবাহনী ক্রীড়াচক্রের সভাপতি হারুনুর রশিদকে। 'আত্মজন প্রীতি' সম্মানে সম্মানিত হওয়ার পর পাল্টা সৌজন্য দেখালেন ওপার বাংলার প্রাক্তন ফুটবলারদের পাশাপাশি কর্তা হারুনুর রশিদ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারকে উত্তরীয় এবং বিশেষ স্মারক তুলে দিয়ে সংবর্ধিত করেন পদ্মাপারের বিশিষ্টজনেরা। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করলেন। অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই 'জয় ইস্টবেঙ্গল' স্লোগানে গমগম করছিল ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র। লাল-হলুদ কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত দল নিয়ে প্রবেশ করতেই সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়তে দেখা যায়। এই আবেগেই পাথেয় করে নতুন মরশুমে এগোতে চান বলে প্রতিষ্ঠা মঞ্চে জানিয়ে দেন লাল-হলুদ কোচ কুয়াদ্রাত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মেহরিন মহম্মদ। ওপার বাংলার শিল্পী মেহরিন মহম্মদের গান শুনে মুগ্ধ এপার বাংলার লাল-হলুদ সমর্থকরা। অনুষ্ঠানে ওপার বাংলার শিল্পীর গানের তালে তালে কোমর দোলাতে দেখা গেল বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গল মহিলা সমর্থকদের।

প্রতিষ্ঠা দিবসে সঞ্চালনার ভূমিকায় বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে এক সূত্রে বেঁধে রাখেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য। সব মিলিয়ে এবার ইস্টবেঙ্গলের ১০৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস এক কথায় জমজমাট।

১৩ আগস্ট ক্রীড়াদিবস

প্রয়াত সচিব দীপক দাসের জন্মদিন পালন মহা সমারোহে

জন্মদিনে প্রয়াত প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল সচিব দীপক (পল্টু) দাসকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রাক্তন ফুটবল সচিব সন্তোষ (বাবু) ভট্টাচার্যর।

সমাচার প্রতিবেদন : শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাণ পুরুষ সচিব দীপক (পল্টু দাস) দাসের জন্মদিনটা বরাবরই ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবারও তার কোনও অন্যথায় হয়নি। ১৩ আগষ্ট, ২০২৩ রবিবার পল্টু দাসের ৮৪তম জন্মদিনটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তারা পালন করলেন ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে। ক্লাব তাঁবুতে জমজমাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল দিনটা। সকাল সাড়ে দশটায় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক তথা বর্তমান মরশুমে ক্রিকেট দলের মেন্টর সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, ফাল্গুনী দত্ত, বিকাশ পাঁজি সহ এক ঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলার। পতাকা উত্তোলনের পর প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ৮৪তম জন্মদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, সরোজ ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী, দেবদাস সমাজদার, সুবীর গাঙ্গুলী সহ অন্যান্য ক্লাব কর্তারা। প্রয়াত সচিবের জন্মদিনে উপস্থিত সবার মুখেই শোনা গেল প্রয়াত সচিব তথা দক্ষ প্রশাসক পল্টু দাসের ভূয়সী প্রশংসার কথা। পল্টু দাসের ৮৪তম জন্ম দিনটা স্মরণীয় করে রাখতে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেন লাল-হলুদ কর্তারা। প্রায় ১৫০ জন ক্রীড়াপ্রেমিক সমর্থকরা রক্ত দেন। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিকেলে বিভিন্ন ক্লাব এবং ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের কর্তাদের হাতে ফুটবল এবং খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয় প্রয়াত সচিব পল্টু দাসের ৮৪তম জন্মদিন উপলক্ষে। সব মিলিয়ে প্রয়াত সচিব পল্টু দাসের জন্মদিন উৎসব ঘিরে ছিল মহাসমারোহ।

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি

দীপক (পল্টু) দাসের জন্মদিনে নবসাজে ইস্টবেঙ্গল প্রবেশদ্বার।

পতাকা উত্তোলনে সম্বরণ বন্দোপাধ্যায়

জন্মদিনে লহ প্রণাম

চিকিৎসকদের সংবর্ধিত করছেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুটবল অ্যাকাডেমিকে বল প্রদান করছেন মাঠ সচিব স্বরাজ ভট্টাচার্য

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করছেন লাল-হলুদ সদস্য ও সমর্থকরা।

ভ্রাম্যমান গাড়িতে রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্ত দিচ্ছেন সমর্থকরা।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ইস্টবেঙ্গল স্কুল ফুটবল দলের শিক্ষার্থী। তদারকি করছেন ক্লাব সদস্য বেণীমাধব ভট্টাচার্য।

হৃদ্‌যন্ত্রের পরীক্ষা চলছে স্বাস্থ্য শিবির কেন্দ্রে।

বড় ম্যাচের বড়ে মিঞা

সুমিত ঘোষ, ক্রীড়া সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা

মাঠের লড়াইয়ে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে হাবিবকে রুখছেন প্রতিপক্ষের ফুটবলার।

অমন খ্যাংরাকাঠি চেহারা। উচ্চতা মোটেও উৎসাহিত করার মতো নয়। ওরা বলত, জাঁদরেল ডিফেন্ডারদের সামনে পড়লে তো স্রেফ উড়ে যাবে।

কে জানত, একদিন ওরা সবাই ভুল প্রমাণিত হবে। সারা জীবনের অমূল্য শিক্ষা দিয়ে যাবেন তিনি যে— যতই রোগাপাতলা হও, যতই শারীরিকভাবে দুর্বল দেখাক, যতই বেঁটেখাটো হও, সব বাধাবিঘ্ন জয় করে ফেলতে পারবে যদি জেদ থাকে, সঙ্কল্প থাকে, অধ্যবসায় থাকে, যদি নিজের পেশার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে পারো, যদি হার-না-মানা হও।

মহম্মদ হাবিব— তিনি শুধুই দারুণ ফুটবলার ছিলেন না, কলকাতা ফুটবলের সোনার সত্তর দশকের এক উজ্জ্বল তারকা-মাত্র ছিলেন না। মহম্মদ হাবিব ছিলেন জীবনের এই শিক্ষা যে, তোমার যা কিছু আছে তা নিয়ে হা-হুতাশ না করে বরং সেটাকেই হাতিয়ার করে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শরীর নেই তো কী, মনের কাঠিন্য তৈরি করো। তা দিয়েই জিতবে।

কলকাতার আবির্ভাবের মঞ্চ থেকেই ধরা যাক। ১৯৬৫-র সন্তোষ ট্রফি ফাইনাল। বাংলার মুখোমুখি অন্ধ্রপ্রদেশ। বাংলার রক্ষণের মুখ জার্নেল সিংহ। তখন জার্নেল মানে কুতুব মিনার। আক্রমণের ঝড় ঢুকতে পথ পায় না যাঁর সামনে। কে জানত, চার মিনারের শহরের সতেরো বছরের এক কিশোর টেক্কা দিয়ে যাবে রক্ষণের কুতুব মিনারকেও! সন্তোষ ফাইনালের প্রথম পর্ব ১-১। দ্বিতীয় পর্ব অন্ধ্র জিতল ১-০। গোলদাতা? মহম্মদ হাবিব। জার্নেলকে এত অসহায়, এত দিশেহারা আর কখনও দেখায়নি।

'ভারত গৌরব' সম্মান স্মারক হাতে মহম্মদ হাবিব।

যিনি দেখার, ঠিকই দেখে ফেললেন। ইস্টবেঙ্গল সে বছরই বেশ কয়েক জন প্রধান ফুটবলারকে হারিয়েছে। নতুন ছেলেদের নিয়ে দল গড়ার পরিকল্পনা চলছে। ফাইনালে হাবিবকে দেখে "স্পট" করতে ভুল করেননি জ্যোতিষচন্দ্র গুহ। ওখানেই কথাবার্তা বলে পাকা করে ফেললেন ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে আসা। ১৯৬৬-তে আগমন, তারপর ১৯৮২ পর্যন্ত টানা ময়দান শাসন করা। ওই রকম ছোটখাটো শরীর নিয়ে এত দীর্ঘমেয়াদি রাজত্ব! অভাবনীয়!

কলকাতা ফুটবলের সত্তরের দশক ছিল সোনার দশক। কাছাকাছি সময়ে একের পর এক তারকার আবির্ভাব। সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার, সমরেশ চৌধুরী, শ্যাম থাপা, অশোকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্ত মিত্র। চুয়াত্তরে এলেন সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়দানে তখন চাঁদের হাট। হাবিব তুলনায় নিতান্তই সাদামাটা। তারকাসুলভ ঠাঁটবাট একেবারেই ছিল না, কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন বহু যুদ্ধ জেতানো নীরব যোদ্ধা। ভৌমিকের মতো বুলডোজার ছিলেন না, গোলার মতো শট ছিল না। বা তাঁর মতো বিদেশি সিগারেট টানতেন না, বিদেশি সুগন্ধি মাখতেন না। সুরজিতের শিল্প ছিল না। শ্যামের বাইসাইকেল কিক ছিল না। কিন্তু ধারাবাহিকতায় ছিল অনেকের চেয়ে এগিয়ে। পি কে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "রাজার রাজা!"

ফুটবল-পরিবার থেকে এসেছিলেন। বাবা মহম্মদ ইব্রাহিম ফুটবলার ছিলেন। ছয় ভাইয়ের চতুর্থ হাবিব। সকলেই ফুটবল খেলতেন। তার মধ্যে হাবিব-আকবরই সব চেয়ে নাম করেন। কিন্তু খুবই অভাবের সংসার ছিল। খালি পায়ে খেলতেন, বুট কেনার সামর্থ্যও ছিল না। কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু হাবিবের জীবনের প্রথম বুটজোড়া কেনা হয় কলকাতা থেকে। এক দাদা মইন খেলতেন কলকাতায় মহমেডান স্পোর্টিংয়ে। তিনিই প্রথম বুটজোড়া উপহার দেন ভাইকে। অন্ধ্রপ্রদেশের জুনিয়র এবং সিনিয়র রাজ্য দলের হয়ে একই সঙ্গে খেলে গিয়েছেন হাবিব। ১৯৬৫-তে যোগ দেন হায়দরাবাদ টেলিফোন্‌স-এ। বেতন? মাসিক ১৩০ টাকা। তাঁর জীবনের মোড়-ঘোড়ানো বছর। সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে জে সি গুহের চোখে পড়ে যাওয়াটা পাল্টে দিয়ে যায় জীবনটাই।

নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শতবর্ষ মঞ্চে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন প্রয়াত কোচ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন তিন প্রয়াত ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, মহম্মদ হাবিব। রয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকদের প্রিয় ফুটবলার শ্যাম থাপা।

সেই যুগেও ছিলেন পাক্কা পেশাদার ফুটবলার। প্রচুর ভালো ভালো চাকরির প্রস্তাব পেয়েও গ্রহণ করেননি। তা হলে যে ফুটবলের জন্য সময় কমে যাবে! বড় ম্যাচের সাফল্যের দিক থেকে একমাত্র তুলনা সম্ভবত সুভাষ ভৌমিক। যখন যে ক্লাব দুর্বল হয়ে পড়েছে, হাবিবের শরণাপন্ন হয়ে অবিশ্বাস্য ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৬-তে ইস্টবেঙ্গল যখন এলেন, লাল-হলুদ শিবির বেশ কয়েক জনকে হারিয়ে প্রবল চাপে। এসে প্রথম বারেই লিগ চ্যাম্পিয়ন। ইস্টবেঙ্গলের ১৯৭২-'৭৪ স্বর্ণযুগে অন্যতম প্রধান সারথি, চাণক্য প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। '৭২-এই পিকে দায়িত্ব নেন ইস্টবেঙ্গলের। সে বছরেই লিগ, শিল্ড, ডুরান্ড এবং যুগ্মভাবে রোভার্স জেতেন তাঁরা। ১৯৭৫-এ অভিমান করে ইস্টবেঙ্গল ছাড়েন তিনি। ১৯৭৪-এ মহমেডান-ইস্টবেঙ্গল লিগ ম্যাচ ড্র হওয়ার পরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সচিব ডক্টর নৃপেন দাস সকলের সামনে চিৎকার করে বলে ওঠেন, "হাবিব-আকবরকে ম্যানেজ করে নিয়েছিল মহমেডান। তাই আমরা জিততে পারলাম না।" কেউ তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেনি। হাবিবের নিজের বয়ান অনুযায়ী, প্রিয় কোচ পিকে-ও সে দিন মুখ খোলেননি। তাতেই মনে আঘাত পান বড়ে মিঞাঁ। '৭৫-এ চলে যান মহমেডানে।

পরের বছরেই ডাক আসে মোহনবাগান থেকে। তখন তারা বেকায়দায়। ভালো দল গড়তে দরকার হাবিব-আকবরকে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সেবারই ১৭ সেকেন্ডের মধ্যে আকবরের সেই দ্রুততম গোল সবুজ-মেরুনের ভাগ্য বদলে দেয়। এর পর শুধু লিগই জিতবে না তারা, শিল্ডও ভাগাভাগি করে নেবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে। '৭৭-এ ইস্টবেঙ্গলের কাছে লিগে হারার যন্ত্রণার মধ্যে ইডেনে পেলে-ম্যাচ। যেখানে সম্রাটের চোখে চোখ রেখে লড়ে গেলেন হাবিব। পুরো দলকে তাতিয়ে দিলেন, "পেলেও আমাদের মতো মানুষ। ভক্তের মতো তাকিয়ে না থেকে চলো লড়াই করি।" কসমস-র সঙ্গে ড্র করে মোহনবাগান। শোনা যায়, ম্যাচের পরে বিশ্ববিখ্যাত দশ নম্বর, কলকাতার ফুটবল প্রশাসকদের কাছে জানতে চান, "হু ইজ ইয়োর নাম্বার টেন?"

এর পরেই সবুজ-মেরুনের জয়রথ চলবে আর তাতে মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠবেন হাবিব। শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স জিতে "৭৭-এ মোহনবাগান জার্সিতে ত্রিমুকুট। পরের বছর লিগ জয় এবং বিখ্যাত সেই আরারাত ম্যাচ। ১৯৭৮ সালে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের দল আরারাতের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল। তার আগে ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবে রাশিয়া সফরে গিয়ে ছেড়ে কথা বলেননি শক্তিশালী রুশ ডিফেন্ডারদের। একটি গোলও করে আসেন।

১৯৮০-তে ইস্টবেঙ্গল ফাঁকা করে দিয়ে সবাই চলে গেল মহমেডানে। রক্ষাকর্তা কে হবে? ডাকো বড়ে মিঞাকে। তত দিনে প্রবাদই তৈরি হয়ে গিয়েছে ময়দানে, বিপদে পড়লেই হাবিবকে-স্মরণ করো। উত্তরে দেবে। মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্মভাবে ফেডারেশন কাপ জয়। ইডেনে ১৬ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার জেরে লিগ, শিল্ড বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু মহমেডানের সঙ্গে যুগ্মভাবে রোভার্স খেতাব জয়, এই ভাঙাচোরা দল নিয়েও। '৮১- তে ফের মোহনবাগানে খেলে '৮২-তেই ফিরলেন ইস্টবেঙ্গলে। সেটাই শেষ বছর কলকাতা ময়দানে এবং খুব সুখস্মৃতি হয়ে থাকল না। হাবিব নিজে কয়েকটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অজ্ঞাত কারণে মাঝপথে কোচ অমল দত্ত কথা বলা বন্ধ করে দেন। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি হায়দরাবাদ ফিরে যান। তার পরে অমল দত্তের ফোন পেয়ে ফিরে আসেন, মহমেডানের বিরুদ্ধে খেলেনও, কিন্তু ম্যাচ হারার পরে ফের কোচের মনোভাব পাল্টে যেতে দেখেন। তখন আবার হায়দরাবাদ চলে যান। তত দিনে কলকাতা ময়দান দাপাতেও হাজির হয়ে গিয়েছে নতুন তারকা জুটি। মজিদ-জামশিদ। আর ফেরেননি হাবিব। যদিও অবসরের পরে টাটা ফুটবল আকাডেমির কোচ হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে যথেষ্ট সফল হন।

জ্যোতিষ গুহের প্রস্তাব পেয়েও হাবিব প্রথমে কলকাতায় আসতে চাননি। কিন্তু নইমুদ্দিন ও আফজল আসছেন দেখে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নেন। বাড়িতে মা মানতে চাইছিলেন না। বড় ভাই আজম বুঝিয়ে রাজি করান। সদস্যা হল, কাছাকাছি সময়ে ভারতীয় যুব দলের হয়ে বাইরে যেতে হল। বিদেশ থেকে ফিরছেন বৃহস্পতিবার, ইস্টবেঙ্গলের প্রথম লিগ ম্যাচ শুক্রবার। প্রতিপক্ষ কালীঘাট। কলকাতার মাঠ-ময়দান সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না হাবিবের। কী ধরনের বুট পরে নামতে হবে, তা-ও জানতেন না। জ্যোতিষ গুহ তাঁকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন, কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলার সঙ্গে আপস করতেন না। হাবিব তখন তাঁর বাড়িতেই থাকেন। তবু আগে থেকে বলেননি, প্রথম একাদশে আছেন কি না। ম্যাচের দিন ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে গিয়ে বোর্ডে লেখা নামগুলো গিলতে থাকেন হাবিব। পিটার থঙ্গরাজ, বি দেবনাথ, নইমুদ্দিন, রাম বাহাদুর, সুকুমার সমাজপতি ... তার পরেই মহম্মদ হাবিব! ছিলেন গুরুকৃপাল সিংহ, পরিমল দে, কালিবাবু শর্মাও।

তখনও হাবিব জানতেন না, হায়দরাবাদ আর কলকাতা ফুটবলের মধ্যে কতটা তফাত। দ্রুতই টের পেলেন। হায়দরাবাদে তাঁরা মূলত থ্রু পাসে খেলতেন। তাই বরাবর দারুণ পাস করতে পারতেন তিনি। কিন্তু কলকাতায় প্রথম দিন খেলতে নেমে দেখলেন, কেউ তাঁর থ্রু পাস ধরতেই পারছে না। তার উপরে ভুল বুট পরে নামার জন্য শুরুতেই ধাক্কা। দু'টো স্পাইক উড়ে গেল। প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য দেখে লাল-হলুদ গ্যালারিও তেতে উঠছে। ফুটবলারদের উদ্দেশে ভেসে আসছে গালিগালাজ। এর পরেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সুকুমার সমাজপতির সেন্টার ভলিতে দুর্ধর্ষ গোল করেন হাবিব। আবির্ভাবেই বাজিমাত। সেই পাসের কথা এখন আর মনে করতে পারেন না সমাজপতি। কিন্তু হাবিবের স্মৃতি হিসেবে জ্বলজ্বল করে ছবিটা— রোগাপাতলা ছেলেটা প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সকালে অনুশীলন সেরে দুপুরে তাঁবুতেই ঘুমিয়ে নিচ্ছে। যাতে বিকেলে তরতাজা অবস্থায় ফের অনুশীলনে নামা যায়। ভাই আকবরকেও বকুনি দিয়ে দুপুরে ঘুমোতে বাধ্য করছে। ''জেদ, সঙ্কল্প, দায়বদ্ধতা দিয়ে কত কঠিন পথ অতিক্রম করা যায়, তার উদাহরণ হাবিব''— বড়ে মিঞা চিরমুগ্ধ সমাজপতি।

কলকাতায় এসে প্রথম মরশুমেই দ্রুত কয়েকটি তথ্য জেনে গেলেন হাবিব। গোল করলে তুমি রাজা। বড় ম্যাচে জেতালে তো কথাই নেই। ভক্তরা রোজ মেসে হাজির হবে ফুল, মিষ্টি, উপহার নিয়ে। তেমনই, হেরে গেলে অপেক্ষা করবে কাঁটার অভ্যর্থনা আর গালিগালাজ।

দলবদলে তাঁকে নিয়ে যা সব নাটক ঘটে গিয়েছে, হিচককের থ্রিলারকেও হার মানাতে পারে। আবির্ভাবেই এমন হুল্লোড় তুলে দিলেন তিনি যে, পরের বছরই মোহনবাগান ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করল তাঁকে এবং নইমুদ্দিনকে। বাইরে থেকে খেলে ফিরছিলেন দু'জনে। মোহনবাগান কর্তারা সব বুঝিয়ে দিলেন, বিমানবন্দরের কোন গেট দিয়ে বেরোতে হবে। তাঁরা কোথায় অপেক্ষা করবেন। কী করে যেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ঠিক সেই ছক ধরে ফেললেন। বিমানবন্দরেই নইমকে তাঁরা 'কিডন্যাপ' করে নিলেন। কিন্তু হাবিবকে তুলে নিলেন মোহনবাগান কর্তারা। কিন্তু সই করানোর দিনে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বোমা বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে হাবিব 'হাইজ্যাক' হয়ে সোজা ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে।

১৯৬৮-তে মোহনবাগান যোগ দেওয়া আর এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। মুম্বইতে ভারতীয় যুব দলের শিবির হচ্ছিল। ঠিক হল, ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের নজর এড়াতে ট্রেনে ফেরানো হবে হাবিবকে, হাওড়ার বদলে খড়্গপুরে নামিয়ে সেখান থেকে গাড়িতে নিয়ে আসা হবে শৈলেন মান্নার বাড়িতে। সে বার নির্বিঘ্নেই সই করতে পারলেন সবুজ-মেরুনে। নইমও সঙ্গী হলেন তাঁর। কিন্তু দু'বছরের বেশি থাকতে পারলেন না। ইস্টবেঙ্গলের হাতে ফের 'কিডন্যাপ' হলেন হাবিব। সে বার শান্ত মিত্র ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক হয়েছেন। হাবিবকে ফেরাতে চান। কিন্তু মোহনবাগান আগে থেকেই 'উইথড্র' করিয়ে রেখেছে। কী করে তিনি ইস্টবেঙ্গলে যাবেন? ও দিকে লাল-হলুদের দলবদল স্কোয়াডও মরিয়া। হাবিবকে তুলতেই হবে। বাংলা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে তেহরান যাওয়ার কথা হাবিবের। সুটকেস পাঠিয়ে দিয়েছেন। দু'দিনের মধ্যে তিনিও যাবেন। এর মধ্যেই কী কুক্ষণে যে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে গেলেন পুরনো কিছু জিনিস নিয়ে আসতে! তিন-চার জন এসে সোজা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গোপন ডেয়ার চালান করে দিল। ও দিকে তেহরানগামী দল উড়ান ধরে নিয়েছে, হাবিবের পাত্তা নেই। খবর চাউর হয়ে গেল, তিনি 'কিডন্যাপ' হয়ে গিয়েছেন। এ যে দলবদলের 'কিডন্যাপ', কে বুঝবে! সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি তখন বেচু দত্ত রায়। তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করে ইস্টবেঙ্গল তুলে নিল হাবিবকে।

পারকিনসন'স বা ডিমেনশিয়া কী করে এমন অদম্য জেদ আর সঙ্কল্পকে হারাতে পারে? হয়তো উপরের ময়দানেও বড় ম্যাচের আয়োজন হচ্ছে! চুনী, পিকে, বলরাম, অমল, সুভাষ, সুরজিৎ অনেকেই সেখানে। কেউ 'কিডন্যাপ' করে লুকিয়ে রাখল না তো হাবিবকে, ঠিক সময়ে বার করবে বলে? দেখা যাবে হয়তো পিকে ভোকাল টনিক দিতে দিতে এগোচ্ছেন আর টানেল ধরে চোয়াল শক্ত করে হেঁটে আসছেন তাঁর নীরব যোদ্ধা।

বড় ম্যাচের বড়ে মিঞাঁ।

সৌজন্যে : আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৩ সেপ্টেম্বর২০২৩

মহম্মদ হাবিব

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন - ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮০, ১৯৮২

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে ট্রফি চ্যাম্পিয়ন—

১৯৬৬ - কলকাতা লিগ, শিল্ড, ট্রেডস কাপ

১৯৬৭ - ডুরান্ড, রোভার্স

১৯৭০ - কলকাতা লিগ, শিল্ড, ডুরান্ড

১৯৭১ - কলকাতা লিগ

১৯৭২ - কলকাতা লিগ, শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স, বড়দোলুই

১৯৭৩ - কলকাতা লিগ, শিল্ড, রোভার্স, ডি ভি এম, বড়দোলুই

১৯৭৪ - কলকাতা লিগ, শিল্ড, ডি সি এম

১৯৮০ - ফেডারেশন কাপ, রোভার্স

১৯৮২ - কলকাতা লিগ, ডুরান্ড, দার্জিলিং গোল্ড কাপ

ইস্টবেঙ্গলের হয়ে চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলকারী - মোট গোল ১১৩টি

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্যাচ - ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মোহনবাগানকে ১০টি গোল, মোহনবাগানের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে একটিও গোল করেননি।

বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফি - ১৯৬৯,৭১,৭২,৭৫ চ্যাম্পিয়ন।

ভারতীয় ফুটবল টিমের হয়ে সাফল্য

এশিয়ান গেমস (ব্রোঞ্জ মেডেল) - ১৯৭০

মারডেকা টুর্নামেন্ট (তৃতীয় স্থান) - ১৯৭০

পেস্তা সুকান কাপ (চ্যাম্পিয়ন) সিঙ্গাপুর - ১৯৭১

সম্মাননা

অর্জুন অ্যাওয়ার্ড - ১৯৮০ (কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর)

ভারত গৌরব - ২০১৫ (ইস্টবেঙ্গল ক্লাব)

বঙ্গ বিভূষণ - ২০১৮ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

আন্ডারডগের আল্লা

গৌতম ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক, কলকাতা টিভি

হায়দরাবাদে প্রয়াত হাবিবের বাড়িতে বড় মেয়ের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন কার্যকরি কমিটির সদস্য সুমন দাশগুপ্ত।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শতবর্ষ মঞ্চে প্রয়াত তিন ফুটবলার চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনী গোস্বামী, মহম্মদ হাবিব। রয়েছেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেরি এবং খুব ইচ্ছাকৃত দেরি। ৯৬ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর বড়ে মিয়াঁকে শেষ নিবেদনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে চাই।

স্বাধীনতা দিবসের অলস শেষ বিকেলে লেক মার্কেটের দোকানে ঢুকছি। হঠাৎ এমন কোনও বন্ধুর ফোন যে সচরাচর ফোন করে না। বলল ''একটা এক্সক্লুসিভ খবর দেওয়ার জন্য তোমাকেই প্রথম ফোন করছি। দুঃখজনক খবর। কিন্তু মনে হল এই মানুষটা নিয়ে তুমি এমন অনন্ত উৎসাহী যে তোমাকেই প্রথম জানানো উচিত। একটু আগে হায়দ্রাবাদ থেকে হাবিবের স্ত্রী ফোন করেছিলেন। মহম্মদ হাবিব আর নেই।''

একুশ বছরের তরুণের মৃত্যুসংবাদ শুনছি না তো যে হতবুদ্ধি হয়ে যাব। পার্কিনসন্স এবং ডিমেনশিয়ায় ভুগতে ভুগতে যে বহুবছর রুগ্ন তার চলে যাওয়ার মধ্যে বিশাল ধাক্কা থাকতে পারে না। তবু মহম্মদ হাবিব চলে যাওয়া মানে তো আমাদের যৌবনের চারতলা থেকে পড়ে যাওয়া। মুহূর্তে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমার বন্ধুর মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। মনে হল সে হাবিবকে দেখতে দেখেনি।

সংশয় কাটানোর জন্য নিশ্চিত হতে আবার ফোন করলাম, বলছ কী? আর ইউ শিয়োর? আমি যদিও জানি এই লোক কনফার্মড না হয়ে বলবে না। তবু নিজের দিক থেকে আমার হিরোকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা করছিলাম।

গড়পড়তা দিনে অবশ্য বন্ধুকে রি কনফার্মেশনের জন্য নয়— দ্রুতগতিতে ফোনটা করতাম নিজের চ্যানেলে। ডিজিটাল টিমকে খবর দিতাম। তারপর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজ ও ট্যুইটারে ব্রেকিং দিতাম। মৃত্যু হলেও বিরাট খবর তো! কলকাতায় কোনো রিপোর্টারের কাছে হাবিব-আকবরের লেটেস্ট ফোন নাম্বার আছে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই চেক করতেও সময় লাগতো। ততক্ষণ তো এই স্টোরিটা আমার চ্যানেলে জ্বলজ্বল করবে।

কিন্তু মহম্মদ হাবিব চলে যাওয়া কী করে গড়পড়তা দিন হতে পারে? এটা তো জীবনে কখনো আলাপ না থাকা অপরিচিত গুরুকে হারানো। সেখানে ব্রেকিং শব্দটা নিন্দনীয় শুধু নয় ঘৃণ্য। তাই সব জেনেও হালকা পোস্ট করি, 'কী শুনছি? মহম্মদ হাবিব সত্যি নেই?' হাবিব নেই— নিশ্চিতভাবে লিখব কী করে? নস্টালজিয়া যে পাথরের চাঁই গড়িয়ে আটকে দিল। বলল, মনে রেখো সাংবাদিক সত্ত্বার অনেক আগে মানুষটার কাছে তুমি অদৃশ্যভাবে দীক্ষিত।

১৯৭৩ সেপ্টেম্বর। ইস্টবেঙ্গল টেন্টের ভিতর অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে ঢুকেছি। সঙ্গে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্রদীপ। ওরও নেশা অটোগ্রাফ সংগ্রহ। সবে ইস্টবেঙ্গলের শিল্ড ম্যাচ শেষ হয়েছে। হাফপ্যান্ট পরে এত কম বয়সের ময়দানি অনুপ্রবেশ হয়তো তখন কেউ দেখেনি। তাই সবাই স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। অশোকলাল ব্যানার্জি আর সুভাষ ভৌমিক এক কোণে সিগারেট টানছিলেন। তাঁরা দ্রুত হাত বাড়িয়ে লিখে দিলেন। তখন খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতাম অটোগ্রাফের সঙ্গে কে কী লিখলেন? উল্টোদিকে বসা যিনি দ্রুত ড্রেস ছাড়ছেন তিনি লিখলেন, আই লাভ ইউ ইউ অ্যাজ লাভ মী। তুমি আমাকে ভালোবাসো। তাই আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত এত বছরেও মহম্মদ হাবিবের সেই বার্তার মর্মোদ্ধার করতে পারিনি। আর কেউ কখনো অটোগ্রাফের সঙ্গে এমন কথা লেখেননি।

পাশেই শ্যামল ঘোষ। বরাবরের ভদ্রলোক। অটোগ্রাফ খাতা টানার ফাঁকে খুব স্নেহের সঙ্গে জানতে চাইলেন কোন স্কুল। কোন ক্লাস? অভিভাবক স্থানীয় কেউ সঙ্গে আছে কিনা? হাবিব ওসবের মধ্যে নেই। খস খস করে লিখে স্বপন সেনগুপ্তর সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন, বলটা কোথায় রাখা উচিত ছিল? সেদিন ইস্টবেঙ্গল বোধহয় তিন-চার গোলে জিতেছিল বলে ড্রেসিংরুম ফুরফুরে। প্রমোদ অনুষ্ঠান হতে পারে এমন আবহ। নইলে

কোনো বাবা-কাকা সঙ্গে না থাকা দুই কিশোর অটোগ্রাফশিকারি কী করে এতটা আশকারা পেতে পারে? দিনটার মর্ম সেদিন বুঝিনি। পরে বুঝেছি জীবনের প্রথম হাবিব দর্শন নীরবে শিখিয়েছিল, পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করার পরেও নতুন প্রস্তুতির দরকার হয়। যদি বাকিরা না নেয় তুমি একা নেবে। সংগ্রাম সবসময় দলবদ্ধ ভাবে হবে না। সবাই এত মূল্য দিতেও রাজি থাকবে না। কিন্তু তোমাকে তোমার মতো লাঠিসড়কি নিয়ে সবসময় তৈরি থাকতে হবে।

সত্তর দশকে অর্ধেক ম্যাচে খেলার টিকিট জুটতো না। জুটলেও অভিভাবক ছাড়া যাওয়ার অনুমতি ছিল না। বাড়ি থেকে লুকিয়ে যেতে হতো। তারই মধ্যে জীবনের প্রিয়তম ফুটবলারের খোঁজ পেয়ে যাই— সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

পরবর্তীকালে সেটা ভাগাভাগি হয়ে কিছুদিন মোহন সিং এবং তারপর প্রসূন ব্যানার্জিতে চলে যায়। ফ্যান বয়ের জগৎ একরকম। সে চাকচিক্য, ফ্ল্যাম্বয়েন্সকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়। সাংবাদিকতায় এসে বুঝতে শিখি, হাঁকডাক না করে টিমকে নীরব নির্ভরতা দান, প্রচণ্ড চাপের মুখেও তাকে স্টেডি রেখে দেওয়ার কোনো বিকল্প হয় না। খুঁজতে শিখি, অমোঘ প্রশ্নের উত্তর, টিমের সবচেয়ে দর্শনীয় ফুটবলারই কি সেই টিমের হৃৎপিণ্ড? গৌতম সরকার এবং আরও বেশি করে মহম্মদ হাবিবকে ছোটবেলায় ধরতেই পারিনি। পঙ্কজ রায় যেমন বলতেন ছোটবেলায় মুস্তাক আলি ছাড়া কাউকে ভালোই লাগত না। প্লেয়ার হতে গিয়ে দেখলাম, আমায় মুস্তাক হলে চলবে না। প্লেয়ারের মতো প্লেয়ার হতে গেলে হতে হবে বিজয় মার্চেন্ট।

ঈদ উৎসবে ভাই আকবরকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন প্রয়াত মহম্মদ হাবিব। ছবি : উৎপল সরকার।

খাতাকলম নিয়ে সেদিন সত্তর দশক ছানবিন করে দেখেছিলাম গোটা দশকের পারফরমেন্সে বড়ে মিয়াঁর আগে কেউ নেই। নিকটতম সুধীর কর্মকার।

কিন্তু সুধীরের সেরা সময় ১৯৭০-৭৫। এর পর ভাঁটার টান।

সমরেশ চৌধুরী যথেষ্ট ভালো। কিন্তু পুরো দশক জুড়ে ধারাবাহিক নন। ১৯৭৬ তো খুবই খারাপ কেটেছে। সুরজিৎ সেনগুপ্তর জামানা শুরু ১৯৭৩ সালে।

গৌতম সরকার দুর্দান্ত। সম্ভবত হাবিবের পরেই দশকজুড়ে প্রভাব। কিন্তু তাঁর শুরু ১৯৭২।

শ্যাম থাপা। প্রায় সব বড় ম্যাচে গোল আছে। কিন্তু আটাত্তরের পর আর টিমে নিয়মিত থাকেননি। সবচেয়ে বড় কথা ৭১-৭৪ মফতলালে চলে গেছিলেন। সত্তর দশকে চার বছর ছিলেনই না।

প্রসূন-সুব্রত-মনোরঞ্জনদের দাপট শুরু ৭৬-৭৭ থেকে। সত্তর দশকের দ্বিতীয় অর্ধে।

হাবিব এই দশকে সেরার সেরা। কারণ শুরু ও শেষ একইরকম মহিমান্বিত। আশির ফেডারেশন কাপেও মোহনবাগানকে গোল দিয়েছেন। যখন মহামেডান চলে গিয়েছেন সেখানেও প্রতাপে থরথর করেছে কলকাতা মাঠ। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল আছে সাদাকালো জার্সিতে। মোহনবাগানের হয়ে নেই। কিন্তু ১৯৭৬-৭৯ কী সার্ভিসটাই না দিয়েছেন মোহনবাগানকে। হাবিব ছাড়া অসম্ভব ছিল সাতাত্তরের ত্রিমুকুট।

অসংখ্য ম্যাচ দেখেছি হাবিবের। চোখ বুজে তিনটে বিদেশি ম্যাচ সবসময় মনে পড়ে। ব্যাপক ডিমেনশিয়া কোনোদিন গ্রাস না করলে মৃত্যু অবধি সেগুলোর স্মৃতি অক্ষত থাকবে। পিয়ং ইয়ং। কসমস। আরারাত।

সেই তিন ম্যাচ থেকে আমার স্মৃতিঘরে থাকা ইমেজারি দেখায়, অবিরাম দৌড়ে চলেছেন হাবিব। হয় ডিফেন্স করছেন বা দুরন্ত ফাইনাল পাস বাড়াচ্ছেন। কখনো মাথা ঝাঁকিয়ে হেড। কিন্তু সারাক্ষণ খেলার মধ্যে। কখনো কোনোদিন তিনি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মধ্যাহ্ন' কবিতা নন যে অলস বিশ্রাম নিচ্ছেন বা ঝিমিয়ে। যেটুকু ক্ষমতা সেটা গুছিয়ে সবসময় ফুটবল মাঠে তিনি উদ্যত চাবুক।

এক ফুটবলার যার হাইট ভালো নয়। যার স্বাস্থ্য সিড়িঙ্গেমার্কা। যার পায়ে ভৌমিকের শট নেই। সুরজিতের ড্রিবল নেই। সে তিনটে ম্যাচেই কী করে অমন রাজত্ব বিস্তার করেছিল? যে শহর থেকে এসেছিল হায়দ্রাবাদের নিজামের ঐশ্বর্যের কথা আজও লোকে বলে। কিন্তু সেই শহরের সহজাত প্রতিভা না থাকা মানুষটা যে ফুটবল ঐশ্বর্যের জৌলুসে ময়দানকে আলো করে দিয়েছিল, তার স্মৃতির ছটা তো নিজামের চেয়েও জোরালো। আর চিরকাল থাকবে।

হাবিব সত্তর দশকের একমাত্র মহা তারকা যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ নেই। কখনও আলাপ করতে যাইওনি। অনেক সুযোগ পরবর্তীকালে এসেছে। কিন্তু নেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্য তো পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। নির্যাসটা নিলেই হল।

এক, যখন যার হয়ে কাজ করবে জান লড়িয়ে কাজ করবে। মনে রাখবে প্রত্যেকটা জার্সিই তার মতো করে বহুমূল্য।

দুই, তোমার মধ্যে কী আছে কী নেই এসব নিয়ে ভাবতে বসো না। তোমার মধ্যে একটা জিনিস থাকলেই চলবে। সমর্পণ।

তিন, তোমার বিপক্ষর দুটো হাত দুটো পা। তোমারও তাই। মাঠে কেউ তোমার চেয়ে এগিয়ে খেলা শুরু করছে না। দূর থেকে মনে হতো, লোকটা ছিল মোটিভেশনের বহমান জলের ট্যাঙ্ক। আজ মনে হচ্ছে, লোকটা ছিল আন্ডারডগের আল্লা।

বছর দুই আগে মোহনবাগানে পিকে-চুনীর স্মরণ অনুষ্ঠান সংযোজন করতে গিয়ে টেন্টে দেখি সপরিবার হাবিব। আকবরের সঙ্গে আলাপ হল। সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে হাবিবের নিবিড় হৃদ্যতা। যদিও মাঝে কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না। ভৌমিক বললেন, "একী কথা যে হাবিবের সঙ্গে আলাপ করবে না? চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি।" সামনে বসিয়ে আমার লম্বা প্রশংসাসূচক ইন্ট্রোডাকশন দিলেন। হাবিবের চোখেমুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সুভাষ তখনি আবিষ্কার করলেন। গভীর দুঃখিতও হয়ে পড়লেন যে তাঁর চেষ্টা বিফলে গেল। "আরে এ তো ভয়ঙ্কর অসুস্থ দেখছি। কবে এসব হল?" তিনিও তখনও জানেন না তাঁদের— ময়দানের বিখ্যাত মোটুমিঁয়া জুড়ির সেই শেষ দেখা। আমি অবশ্য এই জন্মে যে আর হাবিবের সঙ্গে আলাপ হল না তাতে বিন্দুমাত্র মন খারাপের কিছু দেখি না। জবরদস্ত আলাপ তো সেই কবেই দূর থেকে হয়ে গিয়েছে। ওরা ওকে কবর দিয়েছে তো কী। আমাদের মতো মধ্যমেধাকে উদ্দীপ্ত করার অ্যাদ্দিনকার সব মন্ত্র তো আর মাটি খুঁড়ে চাপা দিতে পারেনি।

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্মরণীয় মুহূর্ত

প্রতিষ্ঠা দিবসে সুসজ্জিত ইস্টবেঙ্গল প্রবেশদ্বার।

ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন।

প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী

১০৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কেক কাটছেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন চার অধিনায়ক বিকাশ পাঁজি, মিহির বসু, তরুণ দে, ভাস্কর গাঙ্গুলি, ও আবহনী ক্রীড়াচক্রের প্রাক্তন দুই ফুটবলার আসলাম, মহম্মদ ঘাউস।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সচিব স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজকে সংবর্ধিত করছেন সহ সভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী, সহ সচিব রূপক সাহা। রয়েছেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ১০৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস মঞ্চে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে সংবর্ধিত করছেন ক্লাবের কার্যকরি সমিতির সদস্য দেবব্রত সরকার, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ১০৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস মঞ্চেইস্টবেঙ্গলের কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকারকে সংবর্ধিত করছেন বাংলাদেশের আবহানি ক্রীড়াচক্রের প্রাক্তন সভাপতি হারনুর রশিদ। রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বাংলাদেশের আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রাক্তন সভাপতি হারুনুর রশিদকে সংবর্ধিত করছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

আত্মজন স্মৃতি সম্মান পুরস্কার মেয়র ফিরহাদ হাকিম তুলে দিচ্ছেন প্রয়াত স্ত্রী ইয়াসমিন মোমেন সুরভির হাতে। সঙ্গে মুন্নার পুত্র আজমান সালিদ।

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্মরণীয় মুহূর্ত

প্রতিষ্ঠা দিবস মঞ্চে ইস্টবেঙ্গল আলমানাক বই প্রকাশ করছেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও সচিব সাজি প্রভাকরণ। রয়েছেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিষ গাঙ্গুলী।

কুয়াদ্রাদকে সংবর্ধিত করছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষকে সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল সহ সভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী, সহ সচিব রূপক সাহা।

ওপার বাংলার ফুটবলার আসলামকে সংবর্ধিত করছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার প্রদীপ রায়কে সংবর্ধিত করছেন স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ, পাশে ইস্টবেঙ্গল সহ সচিব রূপক সাহা, প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সহ সভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী।

ওপার বাংলার ফুটবলার ঘাউসকে সংবর্ধিত করছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বাংলা দেশের সঙ্গীত শিল্পী মেহরিন মাহমুদকে সংবর্ধিত করছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

লাল-হলুদ জার্সিতে অদৃশ্য শক্তি ভর করত ঃ মহম্মদ হাবিব

বিপ্লব দাশগুপ্ত, প্রবীণ বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক

হ্যাঁ, আমি একজন ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাকে ৬৬'তে নিয়ে এসে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি ময়দানের তিনটি ক্লাবে খেললেও লাল-হলুদ জার্সির প্রতি আলাদা একটা টান অনুভব করি। কেন জানি না। তাই হয়তো ডার্বি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ১০টি গোল করেছি। কিন্তু মোহনবাগানের হয়ে একটিও নয়। ইস্টবেঙ্গল আমাকে লালন-পালন করেছে। এই ক্লাবের সমর্থকরা আমাকে মাথায় তুলে রেখেছে, সেসব সময় আমি ভুলি কেমন করে। এগুলো আজও আমাকে তৃপ্তি দেয়। খেলা ছাড়ার পরও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই আমাকে আমার জীবনে সেরা পুরস্কার 'ভারত গৌরব' সম্মানে সম্মানিত করেছে।

চল্লিশের দশক থেকে দক্ষিণ ভারতের ফুটবলাররা বছরের পর বছর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ থেকে শুরু করে আপ্পারাও, সোমানা, ধনরাজ, আমেদ খান, ভেঙ্কটেস, সালে— এরকম আরও দক্ষিণ ভারতীয় ফুটবলার বাংলা তথা ভারতীয় দীর্ঘদিন দাপটের সঙ্গে বিচরণ করেছেন। ১৯৬৬ সালে সেই দলে নবতম সংযোজন হায়দরাবাদের মহম্মদ হাবিব।

১৯৬৫ সালে কলকাতায় আইএফএ শিল্ডে হাবিবের খেলা দেখে চিনতে ভুল হয়নি লাল-হলুদের প্রবাদপ্রতিম সচিব জ্যোতিষচন্দ্র গুহর। সে বছরই সন্তোষ ট্রফিতে এই ছোটখাটো চেহারার হাবিবের দাপটের সামনে বছরে বছরে বিব্রত বোধ করছিলেন জার্নেল সিংয়ের নেতৃত্বাধীন বাংলার দুর্ভেদ্য ডিফেন্ডাররা। ফাইনালে বাংলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল হায়দরাবাদ। ফাইনালের পরই হাবিব, নইম এবং মিডফিল্ডার আফজলের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে দিয়েছিল। তিনজনের সঙ্গেই প্রাথমিক কথাবার্তা অবশ্য হয়েছিল কলকাতায় আইএফএ এত দর্শক সমাগম দেখে ঘাবড়ে যাননি? জবাবে বললেন, 'মাঠে নেমে ঘাবড়ে যাওয়া আমার ফুটবল খতিয়ানে কোনও দিনই ছিল না। বরং আমার মধ্যে সেদিন একটা চ্যালেঞ্জ এসে গিয়েছিল।' যা হল, এত দর্শক কষ্ট করে আমাদের খেলা দেখতে এসেছেন তাঁদের সামনে আমাকেও কিছু একটা করে দেখাতেই হবে।

ভিন রাজ্য থেকে কলকাতায় প্রথম বছরে অনেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। হাবিব, নইম অবশ্য তাঁদের দলে পড়েননি। এ প্রসঙ্গে হাবিব বললেন, "ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরিবেশটাই এমন ছিল যাতে সব সময়ই মনে হতো নিজের বাড়িতেই আছি। ড্রেসিংরুমের পরিবেশ গোটা দলকে একতাবদ্ধ করত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সিনিয়রদের সঙ্গে জুনিয়ারদের দূরত্ব থাকবে না। পিটার থঙ্গরাজ, অধিনায়ক চন্দন ব্যানার্জী, প্রশান্ত সিনহা, পরিমল দে, সুকুমার সমাজপতির মতো সিনিয়র ফুটবলাররা প্রথম দিন থেকেই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ড্রেসিংরুমে হাসি-ঠাট্টা-আহ্লাদ ভিন রাজ্যের ফুটবলারদের মেস ছিল ডোভার লেনে। সেখানে প্র্যাকটিসের দিনে ভোরে ঘুম ভাঙত রায়বাহাদুর পিটার থঙ্গরাজের ডাকে। "বাচ্চা ওঠ, প্র্যাকটিসে যেতে হবে।" হাবিব বলেছিলেন এখনও ওদের ডাক আমার কানে বাজে। মাঠে হাবিবের সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়া ছিল পরিমল দে-র। হাবিব বললেন, "পাশে জংলাদা (পরিমল দে) সব সময়ই গাইড করবেন। ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবেন। জংলা দা-র খেলা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতাম। বলের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন।" সব মিলিয়ে প্রথম বছরের সুখস্মৃতি হাবিব চিরদিন মনে রেখেছেন।

তবে তিক্ত স্মৃতিও ছিল। লিগের দ্বিতীয় পর্বে মোহনবাগান ম্যাচে। ২৮ জুলাই, শনিবার খেলা ছিল মোহনবাগান মাঠে। সে ম্যাচের আগে ময়দানে গুজব ছিল একনাগাড়ে পাঁচ বছর লিগ জিতে মহামেডানের (১৯৩৪-১৯৩৮) রেকর্ড স্পর্শ করার জন্য মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গল হারে। ক্লাব সচিব জ্যোতিষ গুহর কাছে ক্ষোভ জানিয়ে অনেক সদস্য সমর্থক চিঠি পাঠিয়েছেন। দল মোহনবাগান মাঠে যাওয়ার আগে ফুটবলারদের জ্যোতিষ গুহ বলেছিলেন, এই মিথ্যে অপবাদের জবাব দিতে হবে। নাহলে এই অপবাদ চিরদিন বয়ে বেড়াতে হবে। প্রাক্তন ফুটবলার ভেঙ্কটেস বলেছিলেন, আজ তোমাদেরই এর জবাব দিতে হবে।

সেই মুহূর্তে হাবিব এতটাই উত্তেজিত ছিলেন যে, তখনই মাঠে নেমে পড়তেন। খেলা শুরুর বাঁশি বাজার পর থেকেই সদাব্যস্ত হাবিবকে ধরতেই পারছিলেন না মোহনবাগানের ডিফেন্ডাররা। শেষ পর্যন্ত হাবিবকে রোখার জন্য বিশ্রীভাবে বল ছাড়া লাথি মেরেছিলেন মোহনবাগান সর্দার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন হাবিব। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল পি জি হাসপাতালে। এতটাই নির্মমভাবে আঘাত করেছিলেন প্রসাদ তাতে হাবিবের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যজনক ঘটনা হল ওরকম একটা নৃশংস আচরণের পরেও রেফারি নৃসিংহ চ্যাটার্জী চন্দ্রেশ্বর প্রসাদকে মাঠে রেখেছিলেন। হাসপাতালে ভর্তি হয়েও হাবিবের মন পড়েছিল মোহনবাগান মাঠে। জ্ঞান ফিরতেই যখন শুনলেন ইস্টবেঙ্গল জিতেছে তখন যন্ত্রণা অনেকটাই ভুলতে পেরেছিলেন। ওই আঘাতের জেরে তিন মাস মাঠে নামতে পারেননি। বলতে দ্বিধা নেই। ওরকম জখম (লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল) না হলে আরও অনেক কাণ্ড দেখাতেন মহম্মদ হাবিব।

সেই সময়ে ফুটবলারদের দলবদলকে কেন্দ্র করে দুই বড় দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতো। সেই দলবদলের আসরে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫ মহানায়ক ছিলেন মহম্মদ হাবিব। তার মধ্যে ১৯১৭ সালে হাবিবকে প্রায় টেনে নিয়েছিল মোহনবাগান। খবরটা কানে যেতেই ইস্টবেঙ্গল সচিব জ্যোতিষ গুহ তাঁর ক্যাডারদের বলেছিলেন, "হাবিব বাচ্চা ছেলে। মোহনবাগান ওকে ভুল বুঝিয়ে নিতে চলেছে। যেভাবেই হাবিবকে ধরে রাখবে হবে।" সেই নির্দেশমতো আইএফএ অফিস থেকে অজয় শ্রীমানী এবং বিগ ফুটবলার থঙ্গরাজ, আফজল এবং নইম মোহনবাগানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জ্যোতিষ গুহ কখনও কোনও ফুটবলার দল ছাড়বে চাইলে বাধা দিতেন না। হাবিবের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী হয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন মোহনবাগানে এখনই গেলে হাবিবের ক্ষতি হবে। জে সি গুহর সামনে গিয়ে হাবিব কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন "আমি ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে এতটুকু আগ্রহী ছিলাম না। দাদা আজমকে ধরে ওরা আমাকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসেছে।"

ফুটবল জীবনে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে হাবিবের ঝুলিতে ছিল ট্রফি। তার মধ্যে কলকাতা লিগ ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪। আইএফএ শিল্ড ১৯৭০, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪। ডুরান্ড কাপ ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭২। রোভার্স কাপ ১৯৬৭, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৮০ (যুগ্ম),

ফেডারেশন কাপ ১৯৮০ (যুগ্ম), ডি সি এম ১৯৭৩, ১৯৭৪ এবং বর দলুই ট্রফি ১৯৭২ এবং ১৯৭৩। প্রসঙ্গত ইস্টবেঙ্গলের ডুরান্ড কাপ জয়ে পরপর তিনবার ফাইনালে গোল করেছিলেন হাবিব। ১৯৬৭ সালে বিএনআর-র বিপক্ষে। ১৯৭০ সালে মোহনবাগানের বিপক্ষে একাই দুটি গোল এবং ১৯৭২ সালে আবার মোহনবাগানের বিপক্ষে। বৃহত্তম সাফল্য ১৯৭২ সালে ভারতীয় ফুটবলে ত্রিমুকুট (শিল্ড, ডুরান্ড রোভার্স কাপ জয় ১৯৭২ সালে। (সঙ্গে গোল হজম না করে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন)।

বিদেশি দলের বিপক্ষে সব সময়ই অসাধারণ ছিলেন মহম্মদ হাবিব। ১৯৭০ সালে ইরানের প্যাস ক্লাবের বিপক্ষে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন হাবিব। রাইট স্ট্রাইকার অশোক চ্যাটার্জীকে গোলের ঠিকানা লেখা পাস বাড়িয়েছিলেন। অশোক গোল করতে পারেন নি। তারপর নিজেই যখন ইরানী রক্ষণ ভেঙে গোল করতে গেলেন প্রতিপক্ষ সর্দার হাবিবের ট্যাকলে আহত হয়ে মাঠ ছাড়লেন। পরিবর্তে নামলেন পরিমল দে। বাকিটা তো ইতিহাস। সেই ম্যাচ প্রথমে হাবিব বলেছিলেন, "গোল করতে না পারলেও গোলের জন্য জান দিতেও প্রস্তুত ছিলেন অশোকদা। প্রথমার্ধে একবার মাটি থেকে তিন-চার ফুট উঁচুতে একবার যেভাবে শরীরটা ছুড়ে দিয়েছিলেন তাতে দারুণভাবে আহত হতে পারতেন।" রক্ষণে সবার সেরা ছিলেন সুধীর।

আসলে গোটা দলটাই ছিল উজ্জীবিত।

১৯৭৩ সালে শিল্ড ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল। আক্রমণ প্রতি আক্রমণে টানটান উত্তেজনার সেই ম্যাচের সেরা বিশেষ এক দলকে বেছে নেওয়া কঠিন বলেছিলেন ম্যাচের ভাষ্যকার প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি। তাঁর মতে ইস্টবেঙ্গলের তিন বিভাগের তিন জন— সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার এবং মহম্মদ হাবিব শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিল। সে বছরই দিল্লিতে ডিসিএম ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার ৯ জন বিশ্বকাপার সমৃদ্ধ ডক রো ড্যাং-র বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস লড়াই করে কোরিয়ানদের পরপর দু'দিন আটকে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কোরিয়ানরা শেষ পর্যন্ত রিপ্লে খেলেনি। ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসে কঠিনতম ম্যাচ বললেও মনে হয় ভুল হবে না। সেই কঠিনতম ম্যাচে গোটা দলকে উজ্জীবিত করেছিলেন হাবিব। "ইন্ডিয়ায় এসে কী করে আমাদের হারিয়ে যায় দেখব।" এই একটা টোটকাতেই চাঙা ছিল গোটা দল।

দলবদলের আসরে তিনিই ছিলেন মহানায়ক। ১৯৬৭ সালে মোহনবাগান সর্বাত্মক চেষ্টা করেও হাবিবকে নিতে পারেনি। কিন্তু ১৯৬৮ সালে ইস্টবেঙ্গল আর ধরে রাখতে পারেনি। এমনিতে ব্যক্তিগতভাবে হাবিব ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে চাননি। কিন্তু তখন কলকাতায় হাবিবের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন নইম। নইমকে অনেক টাকার বিনিময়ে রাজি করিয়েছিল মোহনবাগান। সেক্ষেত্রে জে সি গুহ বেশি অর্থের বিনিময়ে ধরে রাখতে চাননি। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাবিবকেও যোগ দিতে হল মোহনবাগানে। সে বছর ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন পরিমল দে। প্রিয় জংলাদার নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গলে খেলতে পারলেন না। এই আক্ষেপ কোনোদিন ভুলতে পারেননি। পরিমল দের ওপর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল হাবিবের। পরিমল স্নেহ করতেন হাবিবকে। হাবিব বলেছিলেন, "১৯৭০ সালে যখন ইস্টবেঙ্গলে ফিরে এলাম। ভীষণ খুশি হয়েছিলেন জংলা দাস। তখন সইয়ের ১০ দিন প্রত্যাহারের সুযোগ পাওয়া যেত। সেই কারণে আমাকে ইস্টবেঙ্গলের ডেরায় থাকতে হয়েছিল। তার মধ্যে একদিন ছিল জুম্মাবার। মসজিদে আমাকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন জংলা দা। আমার পাশে বসে মাথায় রুমাল বেঁধে নামাজ পাঠের অভিনয় করেছিলেন। হ্যাঁ, সে বছর ইস্টবেঙ্গলে ফিরে আমার জন্য উদগ্রীব ছিলেন মহম্মদ হাবিব। মোহনবাগান তাঁকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে লুকিয়ে রাখলেও সেলুনে যাওয়ার নাম করে সোজা চলে গিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল শিবিরে।

আক্ষেপটা কিছুটা মিটিয়েছিলেন ১৯৬৮ সালেই সন্তোষ ট্রফিতে। সেবার সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের নেতৃত্বে ছিলেন পরিমল দে। সেমি ফাইনালের প্রথম পর্বে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন হাবিব। একদিন বাদেই ছিল সেকেন্ড লেগ সেমি ফাইনাল। শরীরে তখন স্যালাইন চলছিল। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত বন্ড দিয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিলেন, খেলেছিলেন এবং জিতেও ছিলেন। ফুটবল জীবনে মোহনবাগানের বিপক্ষে সেরা ম্যাচ মনে করেন ১৯৭০ সালের ডুরান্ড কাপ ফাইনাল। ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে জিতেছিল। দুটি গোলই করেছিলেন মহম্মদ হাবিব। এ ছাড়াও গোল করেছিলেন ১৯৭৩ সালে ডুরান্ড কাপের ফাইনাল আরও একবার গোল করেছিলেন ১৯৭২ সালে। কলকাতা লিগে ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭২, ১৯৭৩ আইএফএ শিল্ড, ১৯৭৩ (সেমিফাইনাল) ফেডারেশন কাপ ফাইনাল ১৯৮০। সব মিলিয়ে ১০টি গোল। ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন ভারতীয় দলে প্রথম খেলেছেন ১৯৬৭ সালে। ১৯৭০ সালে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন হাবিব। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের জার্সি গায়ে চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেয়েছেন ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৫। তার মধ্যে ১৯৬৯ সালের ফাইনালে সার্ভিসেসের বিপক্ষে একাই পাঁচটি গোল করেছিলেন। বাংলা জিতেছিল ৬-১ গোলে। সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে সর্বকালীন রেকর্ড। তিন বড় দলেই খেলেছেন।

ইস্টবেঙ্গলে ৯ বছর, মোহনবাগানে ৬ বছর, মহামেডানে ২ বছর। যখন যে দলের জার্সি গায়ে খেলেছেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। তবে টানটা ছিল লাল-হলুদ জার্সির প্রতি একটু বেশি। ১৯৮০ সালে রোভার্স কাপ সেমি ফাইনালে মোহনবাগানের বিপক্ষে মাঝ মাঠে হাবিবের নেতৃত্বে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। পড়ন্ত বেলায় হাবিবের লড়াই দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ গোলাম মহম্মদ বাসা। হাবিব সেদিন বলেছিলেন 'এই জার্সি গায়ে চাপালে একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে ভর করে।" ঘটনা হল ময়দানে তাঁর শুরুটা ১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গলে, শেষ বছরটাও লাল-হলুদ জার্সি গায়েই ১৯৮২ সালে। প্রসঙ্গত হাবিবের ফুটবল জীবনের সেরা সম্মান, স্বীকৃতি ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন বছরেই। ১৯৬৭ সালে জাতীয় দলে প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে প্রি-অলিম্পিকে জাতীয় দলের নেতৃত্ব এবং সে বছরই সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের নেতৃত্ব সব সময়ই হাবিব ছিলেন ইস্টবেঙ্গলে। সর্বোপরি ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্জুন পুরস্কার পেলেন। সে বছরও তিনি ছিলেন ইস্টবেঙ্গলে। ময়দানে ফুটবলার হিসাবে যাত্রাশুরু হয়েছিল ১৯৬৬ সালে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে, ১৯৮২ সালে শেষ বছরটাও খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলে।

অদম্য জেদ এবং ইচ্ছাশক্তি ছিল মহম্মদ হাবিবের মূলধন। ১৯৮০ সালে ইস্টবেঙ্গল টিমটাই ভেঙে গিয়েছিল। তখনও পড়ন্ত বেলায় মহম্মদ হাবিব এবং সুধীর কর্মকার তাঁদের প্রিয় কোচ প্রদীপ ব্যানার্জীকে আত্মবিশ্বাসের সুরেই বলেছিলেন "গতবার ইস্টবেঙ্গল সেরা দল গড়েও কোনও ট্রফি পায়নি। এবার এই ভাঙা দল নিয়েই ট্রফি জিতব।" প্রসঙ্গত সে বছর ইস্টবেঙ্গল যুগ্মভাবে ফেডারেশন কাপ এবং রোভার্স কাপ জিতেছিল। এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন কী হিসাবে? হাবিব বলেছিলেন "ভারতীয় ফুটবলারদের দৌড় আমার জানা ছিল।" প্রসঙ্গত সে বছর ভারতীয় কোনও দলের কাছে ইস্টবেঙ্গল হারেনি হায়দরাবাদে থাকলেও সুযোগ পেলেই ছুটে আসতেন ফুটবল মক্কায়। এরকমই একবার এসেছিলেন। তখন 'খেলা' পত্রিকায় একটা বিশেষ লেখার জন্য হাবিবের কাছে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা শেষে বললেন, চল একটু ময়দানে ঘুরে আসি। দুই মাঠেই গিয়েছিলাম। তবে বেশি সময় ছিলেন ইস্টবেঙ্গল মাঠে। অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন মাঠের দিকে। হয়তো এই মাঠেই প্রথম বড় ম্যাচে গোলের ছবি তাঁর চোখে ভাসছিল। এরকম আরও অনেক। হাবিবের দুর্ভাগ্য ইস্টবেঙ্গলে ৯ বছর খেললেও কোনোদিন অধিনায়ক হতে পারেননি। ১৯৭৫ সালে যেবার ইস্টবেঙ্গল এক নাগাড়ে ছ'বছর কলকাতা লিগ জিতে মহামেডানকে টপকে গিয়েছিল। সে বছর তাঁরই অধিনায়ক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটা মহল থেকে প্রবল চাপের জন্য হাবিব অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাল-হলুদ জার্সির মায়া কাটিয়ে মহামেডানে যোগ দিয়েছিলেন। এই আক্ষেপটা তিনি ভুলতে পারেননি সারা জীবনে।

সদ্যপ্রয়াত 'ইস্টবেঙ্গল গৌরব' মহম্মদ হাবিব

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, ক্রীড়া সাংবাদিক, প্রাক্তন আনন্দবাজার পত্রিকা

হায়দরাবাদে হাবিবের বাড়িতে শ্রদ্ধা কার্যকরি কমিটির সদস্য সুমন দাশগুপ্ত।

শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কেক কাটছেন মহম্মদ হাবিব।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায় ...?

সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৬তম বর্ষপূর্তি দিবসের সকাল থেকে ময়দান তোলপাড় করা একটার পর একটা মহাকরণের খবরে ফুটবল রোম্যান্টিক হৃদয় ছারখার হবে কে জানত?

১৫ আগস্ট ২০২৩-এ সেটাই ঘটল।

ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে জানতে পারলাম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বর্ণময় প্রাক্তন ফুটবল সচিব সুপ্রকাশ গড়গড়ি চিরকালের মতো না-ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন। বেশ কয়েক বছর 'অভিমানে' লাল-হলুদ তাঁবুতে যেতেন না। কিন্তু 'নাইটেঙ্গল অফ ইন্ডিয়া'রও পর্যন্ত গভীর স্নেহাস্পদ গড়গড়িদা লতা মঙ্গেশকরকে এনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বিশাল সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান গাইয়ে ছিলেন। ময়দানের ফুটবলের সোনার সময়ের মতো সেটা ছিল ইস্টবেঙ্গলেও সুপ্রকাশ গড়গড়ির গোল্ডেন টাইম। চিমা-কৃশানু-বিকাশ বিপক্ষের ভয়ঙ্কর ত্রিমূর্তিকে ইস্টবেঙ্গলে একসাথে খেলানো তো বটেই, বান্ধবী ক্যাথি-র সঙ্গে চিমা ওকোরির বিয়ের যাবতীয় বন্দোবস্তও করেছিলেন লাল-হলুদ ফুটবল সচিব থাকাকালীন গড়গড়িদা।

সুপ্রকাশ গড়গড়ির সঙ্গে নানান স্মৃতিকথা মনে করতে করতে বিকেলের দিকে আরও ভয়ঙ্কর খারাপ খবর— মহম্মদ হাবিব আর নেই।

ময়দানের বাদশা নিয়ে যত কথাই বলা যাক, সেটাকে কম শোনাবে। আক্ষরিক অর্থেই ভারতীয় ফুটবলের বড়েমিঞা। সর্বকালের অন্যতম ফাইনেস্ট ফুটবলার হাবিবকে তাঁর দুই বিখ্যাত টিমমেট সুভাষ ভৌমিক আর সুব্রত ভট্টাচার্য তাঁদের আত্মজীবনীতে বাছাই সেরা একাদশের ফরোয়ার্ড লাইনে চোখ বন্ধ করে শুধু রাখেননি। প্রয়াত ভৌমিকদা আর এই সেদিন বাবলুদা দুজনেই নিজেদের আত্মজীবনী বইয়ের সহলেখক হিসেবে আমাকে জোর গলায় বলেছিলেন, ময়দানে তাঁদের ফুটবল গুরু বোধহয় পিকে-র চেয়েও বেশি মহম্মদ হাবিব। দুজনকেই ওই খেলেয়াড় জীবনে কথায়-কথায় হাবিবের ধমকানো 'জুতা মারুঙ্গা' শব্দগুচ্ছোকেও সুভাষ ভৌমিক আর সুব্রত ভট্টাচার্য আত্মজীবনীতে লিখিত ভাবে বলেছেন, তাঁদের কাছে আসলে ওটা ছিল বড়েমিঞার থেকে পাওয়া আশীর্বাদ। দুই সুপারস্টার বঙ্গ ফুটবলারই অকপটে বইতে স্বীকার করেছেন, ময়দানের সোনার সত্তরের দশকে মহম্মদ হাবিবের অনুশাসন তাঁদের ওপর না থাকলে সুভাষ ভৌমিক আর সুব্রত ভট্টাচার্য হয়ে উঠতে পারতেন না কোনও দিনও। ঠোঁটকাটা সুব্রত তো 'ষোলো আনা বাবলু' উৎসর্গ পর্যন্ত করেছেন মহম্মদ হাবিবকে। স্পষ্টবক্তা প্রয়াত ভৌমিক 'গোল'-এ সব চেয়ে বেশিবার যে ফুটবলারদের নাম সসম্মানে উল্লেখ করেছেন তিনি— মহম্মদ হাবিব।

আর তিনি— দ্রোণাচার্য পিকে? তাঁর কোচিং আত্মজীবনী 'গুরু'তে প্রদীপ ব্যানার্জি অসংখ্য শিষ্যের ভিড় থেকে শ্রেষ্ঠ পাঁচজন ফুটবলার, যাঁদের তিনিই পঞ্চপাণ্ডব নাম দিয়েছিলেন, বাছতে গিয়ে হাবিবকে বলেছিলেন অর্জুন। মধ্যমণি। বেস্ট অ্যামং দ্য বেস্টস্. সেরাদের সেরা।

এই খুচরো ক্রীড়া সাংবাদিকদের পরম সৌভাগ্য, আমার বিখ্যাত পুরনো সংবাদপত্র অফিসের হয়ে হাবিবের ওপর ধারাবাহিক ফিচার লিখতে ২০১৫-এ হায়দরাবাদে ময়দানের বাদশা-র বাড়ি সহকর্মী ফটোগ্রাফার উৎপল সরকারকে নিয়ে টানা চারদিন কাটিয়েছিলাম।

কিন্তু কে জানত তার কয়েক বছরের ভেতর 'ময়দানের নিজাম ফুটবলগ্রহের মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মতো চলে যাবেন! তাঁর অগণিত ভক্তদের হৃদয়ে ভেঙে দিয়ে। শেষবার বড়েমিঞার মতো মেজাজে ২০১৯-এ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাঁর আজন্মের প্রিয় কলকাতায় এসেছিলেন হাবিব। তারপর থেকে উত্তরোত্তর অসুস্থ হয়ে পড়ার পালা সত্তরোর্ধ্ব চির লড়াকু প্রাক্তন ফরোয়ার্ডের।

মোহনবাগানে পিকে-চুনী'র কনডোলেনস্ অনুষ্ঠানে বছর দুই আগে সর্বশেষবারের মতো ময়দানে যখন এসেছিলেন হাবিব, বেশ নড়বড়ে। শেষ একবছর গভীর অ্যালঝাইমার্সে ময়দানের সোনার স্মৃতিটুকুও মনে করতে পারতেন না আর। স্ত্রী ছাড়া কারও সঙ্গে কথাও কার্যত বলতেন না। বিখ্যাত ফুটবলার ভাই মহম্মদ আকবরকেও প্রায় চিনতে পারতেন না।

কিন্তু তবুও ছিলেন তো মানুষটা। ভারতীয় ফুটবলের নবাব— তিনি বড়েমিঞাঁ। স্বাধীনতা দিবসের বিকেল থেকে ভারতীয় ফুটবলকে যেন পরাধীন করে চলে গেলেন সেই মহম্মদ হাবিব। ময়দানের নিজাম।

বড়েমিঞাঁর দাদাগিরি ...

শালা, মজাক হ্যায়! কেয়া সমঝা? জিন্দেগি মে দোবার অ্যায়সা চান্স হামকো মিলেগা?''

সত্তর দশকের গোড়া দিক। রোভার্স ফাইনালের দিন মুম্বইয়ে ইস্টবেঙ্গল টিম হোটেল। বেলা এগারোটা বাজতে চলেছে। আর সেই সময় কখনও সুধীর-পিন্টু, আবার কখনও গৌতম-সুভাষের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গর্জন করে চলেছেন হাবিব। বড়ে মিঞাঁর সে এক রুদ্রমূর্তি তখন।

পিন্টু-গৌতমদের সকালে বারবার ডেকেও দরজা খোলাতে না পেরে, কোচ পিকেও হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

''ওরে হাবিব, দেখ তো বাবা পারিস কি না বজ্জাতগুলোর ঘুম ভাঙাতে! ভোররাত পর্যন্ত ফুর্তি করলে, সকালে উঠবে কী করে? আজ যে ফাইনাল, সেই হুঁশটুকুও নেই!'' বলতে বলতে প্রদীপ ব্যানার্জিরও চোখে তখন জল বেড়িয়ে আসার জোগাড়। মহাগুরুর শেষ কথাটা শুধু মুখ থেকে বেরনোর অপেক্ষা। প্রিয়তম শিষ্য হাবিব তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

''কেয়া বোলতা হ্যায় প্রদীপদা? শালা কো মজাক হ্যায় না কেয়া!'' চিৎকার করতে করতে হাবিব নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটলেন সুধীর-সুভাষদের ঘরের দিকে। তারপর সেই রুদ্রমূর্তি। গর্জন, গালিগালাজের ঝড়। পারলে টিমমেটদের দরজা লাথি মেরে ভেঙে দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে সুধীর-পিন্টু-গৌতমরা যে যাঁর ঘর থেকে সুবোধ বালকের মতো বেরিয়ে এলেন। রেডি হয়েই সটান কোচের ঘরে টিম মিটিংয়ে এবং একেবারে সঠিক সময়ে!

আজম 'অত্যাচার' ...

সত্তর দশকের ময়দানের মহারথী ফুটবলারদেরও তিনি লিডার। অথচ সেই হাবিবও হায়দরাবাদে ফিরলে দাদা আজমের 'অত্যাচারের' শিকার। ভাবা যায়! ওঁদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় আজম। সারা জীবন হায়দরাবাদ পুলিশ টিমের হয়ে দাপটে খেলেছেন। পঞ্চাশের দশকে টানা পাঁচ বার রোভার্স চ্যাম্পিয়ন হায়দরাবাদ পুলিশ দলের তিনি একজন। পরে দেশের অন্যতম সেরা ফুটবল রেফারি। একই সঙ্গে 'কুখ্যাত' পুলিশ অফিসার।

আট বছর আগে হায়দরাবাদের বাড়িতে ড্রইংরুমে তখন হাবিব আমার আর সঙ্গী ফটোগ্রাফার উৎপল সরকারের সামনে একা বসে। বিবি, মেয়ে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিরা সব অন্দরমহলে। একটু যেন আমতা আমতা করেই আজম প্রসঙ্গে বলছিলেন বড়েমিঞাঁ, এমনও কয়েকবার হয়েছে, কলকাতার বড় টিমের অ্যাডভান্স রাখতে আমি দু-একদিনের জন্য হয়তো বাড়ি ফিরেছি। দাদা আমাকে ধমকে-চমকে সেখান থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে নিয়েছেন। নিজের দাদা তো, নিতেই পারে। কিন্তু কেড়ে নিত বলে আমার এখনও কষ্ট হয়!" একটু থেমে আরও বললেন, "খুব বদমেজাজি ছিল ও। সারাজীবন পুলিশে চাকরি করেছে তো। নিজে খেলোয়াড় হলেও, বাকি সময়টা চোর-ডাকাতের সঙ্গে কাটিয়ে বদমেজাজি হয়ে গিয়েছিল।"

ফুটবলার আজমকে নিয়ে কিন্তু গভীর নস্টালজিক প্রৌঢ় হাবিব, "ছোটবেলায় ওর খেলা দেখেই তো ফুটবলের প্রেমে পড়া আমার।" বসে সখেদে আরও যোগ করলেন মিঞা, "জানেন, ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে টানা পাঁচবার লিগ চ্যাম্পিয়ন যেদিন হয়েছিলাম, প্রথমেই মনে হয়েছিল আজম ভাইও এ ভাবেই টানা পাঁচবার রোভার্স কাপ জিতেছে। ওফ্! আমাকেও সেরকম একটা দুর্ধর্ষ সাফল্যের অনুভূতি দিলেন ইনসাআল্লাহ!"

হায়েস্ট পেইড রহস্য ...

গোটা সত্তর দশক তো বটেই। আশির দশকের গোড়ার দিকে অবসর নেওয়ার দু-এক মরসুম আগে পর্যন্ত হাবিব ময়দানের হায়েস্ট পেইড ফুটবলারদের মধ্যে পড়তেন। কী ভাবে নিজের দর এত উঁচুতে বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন বুট জোড়া তুলে রাখার সামান্য আগে পর্যন্তও? অত দিন পর সেই রহস্যও হায়দরাবাদে বসে প্রথম ফাঁস করেছিলেন বড়েমিঞা, "ও ভি এক গেম প্ল্যান থা দাদা। ডাবল স্ট্রাইকার কা অ্যাটাক, দেখা হ্যায় তো? উসিকে য্যায়সা।" জানকীনগরের বাড়ির উল্টো দিকের রকে আড্ডার মেজাজে বসা হাবিবের ঠোঁটে তখন বিরল মুচকি হাসি!

"ওই সময় বেশির ভাগ সময় আমাকে আর আকবরকে একসঙ্গে নিতে চাইত কলকাতার বড় ক্লাবগুলো। আর আকবরের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়ে আমাদের দরটা আমিই সিনিয়র হিসেবে দিতাম বড় ক্লাবের অফিশিয়ালদের। দু'জনের একসঙ্গে দর। তাতে আমার কত বা আকবরের কত, সেটা পরিষ্কার জানাতাম না। কিন্তু আসলে আমার পেমেন্টটা প্রায় প্রতি বছরই ময়দানে হায়েস্ট থাকত।"

হাবিবের রহস্য ফাঁস করার মুহূর্তেই বাইকে চেপে হাজির আকবর। দাদার কথা শেষ হলেই ভাই সেদিন বলেছিলেন, "মজার ব্যাপার কী হত জানেন? ওই ফর্মুলায় হাবিবভাই যদি কেরিয়ারের শেষের দিকেও আশি-নব্বই হাজারে বড় ক্লাবে খেলেছে, তো আমিও সত্তর-পঁচাত্তরের বেশি পেমেন্ট পেয়েছি। কয়েকবার তারও বেশি।"

পিকে বনাম অমল ...

"আমার মত যদি চান তা হলে বলব, এটা তুলনায় বিষয়ই নয়।" প্রসঙ্গটা উঠতেই যেন নিজের পেনাল্টি বক্সের ভিতর বিপদের গন্ধ পেয়ে লম্বা ক্লিয়ারেন্স হাবিবের।

ততক্ষণে রক থেকে উঠে পড়ে ঘরে চলে এসেছেন। তারপর কী মনে করে বলতে শুরু করলেন, "প্রদীপদাকে ক্লাব কোচের আগেও ন্যাশনাল কোচ হিসেবে পেয়েছিলাম আমি। সেই সত্তরের এশিয়াড থেকেই প্রদীপদার ফুটবল ফিলোজফি আমার আদর্শ। দেখেছি এই খেলাটাই ওঁর ধ্যানজ্ঞান। জিতনা হোগা ভাই, আওর জিতনে কে লিয়ে কোসিস করনা হোগা, হর্ টাইম সপনা দেখতে রহেনা পড়েগা।' আর এটা উনি আমার মধ্যে বুনে দিয়েছিলেন। দিনের পর দিন। প্রথমে ইন্ডিয়া টিমে। তারপর বাহাত্তর থেকে টানা প্রায় যুগ। কখনও ইস্টবেঙ্গলে, তো কখনও মোহনবাগানে।"

মহাগুরু পিকে-কে নিয়ে হাবিবের কথা যেন ফুরোবার নয়, "ডিসিপ্লিন ... হর্ ম্যাচ মে আগ কি তরহা জ্বলনে কা যো হিম্মত, সব শেখা প্রদীপদার থেকে। প্র্যাকটিসে ফুটবলের সব কিছু অসাধারণ ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে দিতেন নিজে। 'পারব না', 'অসম্ভব' শব্দ দুটো ওঁর মুখে কোনওদিন শুনিনি। যেটা নিজের মধ্যেও আমি ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম।"

পিকের প্রেরণা এতটাই হাবিবের উপর প্রভাব ফেলেছিল। বিস্তারিত করলেন মিঞা, "একাত্তরে ইন্ডিয়া টিমের রাশিয়া ট্যুর। মস্কো ডায়নামোর কাছে দু'গোলে পিছিয়ে আছি। বোধহয় সেকেন্ড হাফ হবে। হারব একরকম পাকা। কিন্তু আমার অভ্যেস হারি-জিতি, প্রতিটা বলের পিছনে তাড়া করা। সেটা করতে গিয়েই একবার দেখি আটজন রাশিয়ান ফুটবলারের মাঝে আমি একা। বিশ্বাস করুন আটজন। আর ওরা আমার সঙ্গে বলটা নিয়ে 'মুরগি' খেলা শুরু করল। এ ওকে পাস দেয়, ও তাকে পাস দেয়, সে আবার আরেকজনকে বলটা দিয়ে দেয় ...! আর আমি যার কাছে বলটা যাচ্ছে, তার দিকে ছুটে বেড়াচ্ছি। এভাবে মিনিট খানেক চলল। মুখে ফেনা উঠে আসছে আমার। লেকিন ম্যায় ভি ছোড়নেওয়ালা নেহি। টিমমেটদের ডাকছি। জান দিয়ে চেঁচাচ্ছি ... শালা তুম লোগ কাঁহা মর পড়া? আরে ভাই খুদা কসম। মেরা পাস আও! চেঁচাচ্ছি আর রাশিয়ানগুলোর পায়ে ডাইভ মারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সাচ বাত, এই করতে করতে সত্যিই এক রাশিয়ানের থেকে বলটা কেড়ে নিয়ে ক্লিয়ার করে দিলাম। তারপর নিজে আছাড় মাটিতে। চিৎপটাং!"

একটানা অনেকক্ষণ বলে হাবিব থামলেন। আর উল্টো দিকের সোফার বসে দ্রুত বুঝেছিলাম, এখন এই ঘরে ১৯৭১ বিরাজ করছে।

হাবিব উত্তেজিত, "ছাত্রদের এভাবে চাগিয়ে দেওয়াই তো গুরুর কাজ। প্রদীপদা সেটা পারতেন। আবার ওঁর কোনও স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে টিমের কোনও ফুটবলার একমত না হলেও কিছু মনে করতেন না। বরং ম্যাচে প্রদীপদার স্ট্র্যাটেজি ভুল প্রমাণ হলে নিজের টিমের প্লেয়ারের কাছে দোষ স্বীকার করার মতো স্পোর্টসম্যাগও ছিলেন আমার গুরু।"

এই যদি তাঁর 'প্রদীপদা' হন, তো অমল দত্ত ছিলেন তাঁর চোখে অসাধারণ ফুটবলপাণ্ডিত্য সম্পন্ন এক প্রবল মুডি কোচ। ইগো সর্বস্ব, "অমলদার কোচিংজ্ঞান প্রদীপদার মতোই। অসাধারণ। ওই রকমই ফুটবলঅন্ত প্রাণ। কিন্তু ভীষণ 'আমি আমি' করতেন। প্রায় সবেতেই। আর ম্যান ম্যানেজমেন্ট খুব খারাপ ছিল। কখন যে কোন ফুটবলার সম্পর্কে কী বলে বসবেন!" খুল্লমখুল্লা হাবিব। বলে চললেন, "বড় ক্লাবে কোচিংয়ের চেয়েও বেশি দরকার গেমপ্ল্যান। আর ম্যান ম্যানেজমেন্ট। প্রচুর তারকাকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হয় সেখানে। প্রত্যেক স্টারকে আলাদা আলাদা ভাবে গুরুত্ব দিতে হয়। আবার টিম স্পিরিটও ধরে রাখতে হয়। সেটাই ম্যান ম্যানেজমেন্ট। অমলদা সেখানে নিজেই তারকা সুলভ হাবভাব নিয়ে চলতেন। অথচ ফুটবলার হিসেবে উনি প্রদীপদার পাশে কিছুই নন।"

আবার ছোট্ট একটু থামা। তারপর যেন বোমা হয়ে ফাটলেন, "বলতে পারেন বিরাশিতে ইস্টবেঙ্গল টিমে অমলদার বিশ্রী ম্যান ম্যানেজমেন্টে তিতিবিরক্ত হয়েই আমার অবসর নেওয়ার চিন্তা জাগে প্রথম! পরের বছরই রিটায়ার করি।" চমকে যেতে হয় ওঁর কথায়। সে কেমন? খোলসা করলেন বড়ে মিঞা, "বিরাশিতে ইস্টবেঙ্গলের কী টিম! ভাস্কর থেকে বিশ্বজিৎ। সুধীর থেকে মনা। তরুণ, অলোক, প্রশান্ত, অমলরাজ, মিহির, কার্তিক শেঠ, আকবর। সব পজিশনই দারুণ। অথচ বোধহয় লিগ ছাড়া কোনও ট্রফি নেই গোটা মরসুমে। এখনও মনে আছে, পরের বছরই ইস্টবেঙ্গল প্রদীপদাকে আবার কোচ করেছিল।"

কোচ হাবিব কা গুসসা ...

টিএফএতে তিনি চুনী গোস্বামী-পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই মেগাস্টার কোচেরই ডেপুটি। জামশেদপুরের অ্যাকাডেমিতে টানা পনেরো বছর ছিলেন ফুটবলার তৈরির কাজে। তখন ভারতীয় দলে আসল প্লেয়ার সাপ্লাইলাইন ছিল টিএফএ-ই।

"সেই চাকরিও ম্যাচিওরড্ হওয়ার কয়েক বছর আগে আমি ছেড়ে দিলাম। বেশ কিছু টাকা বোনাস, গ্র্যাচুইটির ক্ষতি করেও," বলেছিলেন হাবিব। বলার সময় আগের সেই উত্তেজনা উধাও। বদলে আবার বিষণ্ণ।

"তার কয়েক বছরের মধ্যে হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিলাম কী ভুলটাই না করেছি। কেন যে ময়দানে বড় ক্লাবের কোচ হওয়ার লোভে পড়লাম ...।" আবারও মিঞার গলায় কষ্ট ঝরে পড়েছিল। "বলতে পারেন ময়দানের নোংরা রাজনীতি দেখে ঘেন্নায় আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে আসি," আবার সেই অবসন্ন সম্রাট।"

রাগ-যন্ত্রণা-দুঃখ সব তখন যেন মাখামাখি হয়ে নবাবের মুখে ফিকে হয়ে যাওয়া রামধনুর চেহারা নিয়েছে। বড় বেদনার সেই রামধনু।

সত্তর দশকের ময়দান কাঁপানো নবাব তখন অসহায় রাগে মনে মনে গুমড়ে যাচ্ছিলেন। বড়েমিঞা যেন হায়দরাবাদের বাড়িতে সেদিন স্বেচ্ছাবন্দি। তবু ফুটবল খেলাটার আস্ত গ্রিনরুমটাকে মনের কোটরে রেখে দিয়েছিলেন। সকলের আড়ালে গোপনে।

আজ সেই 'ফুটবল গ্রিনরুম' চিরদিনের মতো তালা বন্ধ।

হাবিবকে নিয়ে প্রাক্তনদের প্রতিক্রিয়া

হাবিবকে ভোলা সম্ভব নয় : শ্যাম থাপা

প্রয়াত মহম্মদ হাবিব। হাবিব নেই, এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। দুই প্রধানের জার্সি গায়ে আমরা বহু ম্যাচ একসঙ্গে খেলেছি। মাঠে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা দারুণ ছিল। ওর সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রচুর গোল করেছি, ম্যাচ জিতেছি। ছোটখাটো চেহারা হলে কী হবে, সাহসটা ছিল দেখার মতো। স্বদেশি দলের পাশাপাশি বিদেশি দলের বিরুদ্ধেও বহুবার ওকে জ্বলে উঠতে দেখেছি। সবচেয়ে বড় কথা শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দলের প্রতিটি ফুটবলারদের দারুণভাবে উজ্জীবিত করত হাবিব। ১৯৭৭ সালে পেলের বিরুদ্ধে ম্যাচেও হাবিবের হার না মানা মনোভাব জীবনে ভুলতে পারব না। হাবিব মাঠে শৃঙ্খলাপরায়ণ। ফুটবল জীবনে শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল বলেই টানা ১৭ বছর তিন প্রধানের পাশাপাশি বাংলা তথা ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দাপটের সঙ্গে খেলেছে। কলকাতা ময়দানে আমি এবং হাবিব একই বছরে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলা শুরু করেছিলাম। হাবিব এসেছিল হায়দরাবাদ থেকে আর আমি দেরাদুন থেকে। সেবার ইস্টবেঙ্গল দলে ছিলেন রামবাহাদুর, পিটার থঙ্গরাজের মতো তারকা ফুটবলার। আর আমি এবং হাবিব ছিলাম জুনিয়র। তাই প্রথম বছরেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা গড়ে উঠেছিল। যেটা শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। বছর পাঁচেক আগে রাজ্য সরকারের বঙ্গ বিভূষণ পুরস্কার নিতে শেষবার কলকাতায় এসেছিল। নেতাজি ইনডোরে দেখা হয়েছিল। ওটাই যে শেষ দেখা হয়ে থাকবে তা ভাবতে পারছি না। প্রথম বছর কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল মেসে আমি এবং হাবিব থাকতাম। একই সঙ্গে দু'জনে মিলে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যেতাম। অবসর সময়ে দু'জনে শহর কলকাতা ঘুরতাম। এমন কি প্রতিপক্ষ দলের ম্যাচ দেখতেও ময়দানে হাজির হতাম দু'জনে। যেতে ইচ্ছে না করলেও, হাবিবের ভয়ে কিছু বলতে পারতাম না। ওর ব্যক্তিত্বটাই ছিল একেবারে আলাদা।

হাবিবের মতো সাহসী ফুটবলার দেখিনি : রঞ্জিত মুখার্জী

১৫ আগস্ট দিনটা আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক। ঠিক দু'বছর আগে ১৫ আগস্ট আমি হারিয়েছিলাম তিন প্রধানের জার্সি গায়ে খেলা ভাতৃপ্রতীম চিন্ময় চ্যাটার্জীকে। আর এবার স্বাধীনতা দিবসের দিন হারালাম ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বেশি সাহসী ফুটবলার মহম্মদ হাবিবকে। ভারতীয় ফুটবলে যিনি 'বড়ে মিঞা' নামে পরিচিত ছিলেন। চিন্ময়ের মৃত্যুর খবরটার মতো হাবিবদার মৃত্যুর খবরটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। যে কোনও মৃত্যুর খবরই বেদনাদায়ক। কিন্তু কাছের মানুষ যারা, যাঁদের সঙ্গে খেলেছি, তাঁদের চলে যাওয়ার খবরটা বড় কষ্টের। আমি ওর সঙ্গে এক দলেও খেলেছি, আবার ওর বিপক্ষেও খেলেছি। তবে বেশি খেলেছি বিপক্ষে। বেশি সময় বিপক্ষ দলে খেললেও ওর সঙ্গে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বছর তিনেক আগের কথা দীপাবলির সময় আমি হায়দরাবাদ গিয়েছিলাম। তখন ওর সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুবই অসুস্থ ছিল। ডাকাবুকো, সাহসী ফুটবলারটিকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। খেলার মাঠে হাবিবের যে চারিত্রিক জিনিসটা আমার মন কেড়ে নিয়েছিল তা হল, ওর অদম্য লড়াই, সাহস এবং হার না মানা মনোভাব।

হার মেনে নিতে পারতেন না : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

হাবিবদা প্রয়াত, এটা ভাবতেই পারছি না। আজ কত স্মৃতি মনে পড়ছে। আমি ১৯৭৭ সালে ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলা শুরু করি। সেবার হাবিবদা ছিলেন প্রতিপক্ষ দলে। হাবিবদাকে ১৯৮০ সালে পেয়েছিলাম ইস্টবেঙ্গল দলে। দীর্ঘদিন কলকাতা খেললেও মাত্র এক বছর আমি হাবিব দার সঙ্গে একই দলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর ওই এক বছর ওনার সঙ্গে খেলার সুবাদে বহু কিছু শেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁর থেকে শিখেছিলাম কী ভাবে একজন ফুটবলার কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে নিজেকে বাঁধতে হয়। ফুটবল ছাড়া অন্য কোনও বিষয় প্রাধান্য পেত না হাবিবদার কাছে। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন প্রচণ্ড শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। কখনও ফুটবল ছাড়া অন্য কোনও আলোচনা করতে দেখিনি। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হোক কিংবা অনুশীলন ম্যাচ হোক কিছুতেই হার মেনে নিতে পারতেন না হাবিবদা। ৮০ সালে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন ম্যাচে হাবিবদার দল হারতে থাকলে গোল শোধ না হওয়া পর্যন্ত ম্যাচ চালিয়ে যেতে হতো কোচ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আবার প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে দল হারতে থাকলে গোল শোধের জন্য কী ভাবে মরিয়া হয়ে উঠতেন তা ভাবা যায় না।

হাবিব স্যার ছিলেন আমার অভিভাবক : দীপেন্দু বিশ্বাস

১৫ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম হাবিব স্যার প্রয়াত। খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার ফুটবল জীবনে হাবিব স্যারের অবদান অনেকখানি। ১১ বছর বয়সে আমি যখন টাটা ফুটবল আকাডেমিতে যোগ দিই, তখন হাবিব স্যার কোচ। হাবিব স্যার মানেই শৃঙ্খলা। কঠোর অনুশীলন। স্যার দু'বেলা অনুশীলন প্রচণ্ড খাটাতেন। আমার সতীর্থ ছিল কল্যাণ চৌবে, রেনেডি সিং, শঙ্করলাল চক্রবর্তী। স্যারের কঠোর অনুশীলনের ভয়ে আমরা সবই তটস্থ থাকতাম। সপ্তাহে দু'দিন পাহাড়ি এলাকায় আমাদের অনুশীলনের জন্য নিয়ে যেতেন। তারপর শুরু হতো কঠোর অনুশীলন। একদিকে কড়া অনুশীলন, অন্যদিকে শৃঙ্খলা। এমনকি বিদেশের মাটিতেও স্যারের অনুশাসন ছিলও একইরকম। কঠোর অনুশীলন করালেও, আমাদের আগলে রাখতেন দারুণভাবে। যে বছর টাটা ফুটবল আকাডেমি থেকে কলকাতা ময়দানে খেলতে এলাম, সে বছর আমার দলের কোচ ছিলেন হাবিব স্যার। কলকাতা ময়দানে স্যার তিন প্রধানের দশ নম্বর জার্সি গায়ে খেলেছেন। আমারও জার্সি নম্বর ছিল দশ। স্যার ছিলেন আমার অভিভাবক। তাই স্যারকে হারানোর যন্ত্রণা সহজে ভুলতে পারব না।

ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণ যুগের ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানি প্রয়াত

সমাচার প্রতিবেদন : ১৫ আগস্ট ২০২৩, প্রয়াত হয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম সফল ফুটবল সচিব ও রিক্রুটার সুপ্রকাশ গড়গড়ি। আর ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার জীবনাবসান হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্বর্ণযুগের ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানির। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। প্রয়াত প্রাক্তন সচিব জ্যোতিষ গুহর হাত ধরে অজয় শ্রীমানি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য হন। শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নয়, পড়শি পাড়া ক্লাবের সদস্য ছিলেন তিনি। দুই প্রধানের সদস্য হলেও, অজয় শ্রীমানি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক হিসেবেই কাটিয়ে গেছেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন লাল-হলুদের ফুটবল সচিব। তাঁর আমলে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয় বহু টুর্নামেন্টে। ৭২-র মরশুমে ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগে কোনও গোল হজম না করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি ত্রি মুকুট জয় করে। এমন কি ১৯৭৫ সালে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৫-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেছিল। বড় ম্যাচের বড় ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডটা আজও অক্ষত রয়েছে। ফুটবলারদের কাছে বিশেষ করে সুভাষ ভৌমিক, সুধীর কর্মকার, সদ্য প্রয়াত মহম্মদ হাবিব, স্বপন সেনগুপ্তর কাছে খুব কাছের মানুষ ছিলেন সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি পরিহিত অজয় শ্রীমানি। সত্যি কথা বলতে কী ফুটবলারদের প্রকৃত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, অভিভাবক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। অজয় শ্রীমানির মৃত্যুর খবর শুনেই তাঁর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে হাজির হন ইস্টবেঙ্গল সহ সচিব রূপক সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, সঞ্জীব আচার্য, রজত গুহ সহ প্রাক্তন লাল-হলুদ অধিনায়ক সমরেশ চৌধুরি, বিকাশ পাঁজি। ফুল, মালা, লাল-হলুদ পতাকা তাঁর মরদেহে জড়িয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার সহ অন্যান্য কর্তা এবং প্রাক্তন ফুটবলাররা। শ্রদ্ধা জানাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। তাঁর প্রয়াণে কলকাতা ময়দান তথা বাংলা ফুটবলে এক যুগের অবসান ঘটল।

প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানি

ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সংবর্ধিত স্মারক হাতে প্রয়াত অজয় শ্রীমানি

প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানিকে শেষ শ্রদ্ধা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার, সঞ্জীব আচার্য সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্তাদের।

৭৩'র মরশুমে অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্তর নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল দল মাঠে নামছে। পাশে সফল ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানি।

৯০-এর দ্বিতীয়বার ত্রিমুকুট জয়ী ইস্টবেঙ্গল ফুটবল সচিবকে স্মরণ : দেবব্রত সরকার

স্মরণ সভায় হাবিব, সুপ্রকাশ গড়গড়ি ও অজয় শ্রীমাণিকে স্মৃতিচারণ করছেন কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

সমাচার প্রতিবেদন : খুব ছেলেবেলায় যখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যাতায়াত শুরু করলাম, পল্টুদার ছায়াসঙ্গী হিসেবে অনেক মানুষকে দেখেছিলাম, তার মধ্যে গড়গড়িদা অন্যতম ছিলেন। তারা সবাই পল্টুদার নেতৃত্বে একত্রিত ভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, যাতে ক্লাবের বিভিন্ন কর্মযোগ্যকে সুচারুরূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এদের মধ্যে রঞ্জনদা, টুকটুকদা, অশ্রুদা, জীবনদা, পরবর্তীতে স্বপনদা সবাই এক এক করে চলে গেলেন। গড়গড়ি দা, তুমিও চলে গেলে। এই প্রতিষ্ঠানটা একশো বছর ধরে চলছে এরকম বহু মানুষের আত্মত্যাগ এর মধ্যে দিয়ে, গড়গড়িদা ছিলেন এদেরই মতো একজন।

অনেকেই হয়তো জানেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয়বার ত্রিমুকুট পায় নঈমুদ্দিনের প্রশিক্ষণে ১৯৯০ সালে। প্রথমবার পেয়েছিলো প্রদীপ ব্যানার্জির প্রশিক্ষণে ১৯৭২ সালে। কিন্তু এই দ্বিতীয়বার, ১৯৯০-এ আমরা একক ভাবে তিনটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। শিল্ডে মহামেডানকে হারিয়ে এবং ডুরান্ড ও রোভার্সে মাহিন্দ্রাকে হারিয়ে। সেইসময় গড়গড়িদা ছিলেন ফুটবল সচিব। তবে শুধু ফুটবল সচিবরূপে তিনি নিজেকে বেঁধে রাখেননি, কখনো তিনি টিমের ম্যানেজার রূপে কাজ করেছেন আবার কখনো নিজে বাজারে গিয়ে বাজার করে নিজের হাতে রান্না করে প্লেয়ারদের খাইয়েছেন। কখনো আবার প্লেয়ারদের কোনো আর্থিক অসুবিধে হলে পল্টুদার সাথে কথা বলে সেটা মেটাতেন।

গড়গড়িদা ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অন্তপ্রাণ। তার কয়েকটি ঘটনার কথা ব্যক্ত করি। সম্ভবত ১৯৮৭ কিংবা ১৯৮৮ হবে, গড়গড়িদা ভোরবেলায় আমাকে ফোন করে বললেন, "আজ ম্যাচ কটায়?" আমি ৪.৩০ বলাতে, গড়গড়িদা ছেলে মানুষের মতো ম্যাচের সময় পিছানোর আব্দার শুরু করলেন। সেটা যে হয় না, সেটা তিনি জানতেন। আসলে তখন তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গে, সেখান থেকে ওই সময়ের মধ্যে পৌঁছনো খুবই কঠিন। তবু শিলিগুড়ি থেকে ভোরবেলায় বেরিয়ে বিকেলে ক্লাবের মাঠে আমাদের একটা ম্যাচ দেখবেন বলে। ম্যাচে বিরতি অবধি গোল হয়নি, সবাই খুব টেনশনে আছে। দ্বিতীয় অর্ধে ইস্টবেঙ্গল গোল করার পর গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে গড়গড়িদার সেই আনন্দ প্রকাশ করে নৃত্য আজও আমার চোখে ভাসে। যেন কোনো শিশুর অনাবিল আনন্দ প্রকাশ, ক্লাবকে মন থেকে কতটা ভালোবাসলে এরকম ক্লাব অন্তপ্রাণ হওয়া যায়, গড়গড়িদার মধ্যে সেটা দেখেছিলাম।

আরেকটা ঘটনার কথা বলি, একটা সময় টিম পরপর ফাইনালে উঠছে, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হতে পারছে না। তা সবাই বলাবলি শুরু করলো গড়গড়ি দা ফাইনালে থাকলেই টিম চ্যাম্পিয়ন হয় না। এরকমই একদিন এয়ারলাইনস কাপের ফাইনালে উঠলো ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। গড়গড়িদাকে কিছু না জানিয়েই সবাই লুকিয়ে শিলিগুড়ি চলে গেল ফাইনাল দেখতে। সেটা খবর পেয়ে গড়গড়িদা সকাল বেলায় শিলিগুড়ির হোটেলে ফোন করে বললো, "আমাকে না জানিয়ে তোমরা সকলে চলে গেলে, দাঁড়াও আমি আসছি"। ওদিকে তখন টিম এক গোলে পিছিয়ে আছে, গড়গড়িদা মাঠে এলেন, পর পর চার গোল দিয়ে টিমকে চ্যাম্পিয়ন করে নিয়ে এলেন।

এরকম ছোটো ছোটো বহু ঘটনা আছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। গড়গড়িদার বিদেহী আত্মাকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। তাঁর পরিবারকে আমার এবং ক্লাবের তরফ থেকে সমবেদনা জানাই।

আমরা গুটিকয়েক মানুষ এখনো ক্লাবের সঙ্গে আছি, যারা গড়গড়িদার সঙ্গে একসাথে কাজ করেছি। আমরা পল্টুদা, জীবনদা, চিনুদা, গড়গড়িদা এঁদের কাছ থেকেই ক্লাবের পতাকা যে 'মা' সেটা ভাবতে শিখেছিলাম। আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এটা শেখানোর চেষ্টা করি যে মাতৃ রূপে পতাকাকে ভালোবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে।

গড়গড়িদার পরিবারের পাশে আমরা যেমন ছিলাম, আগামীতেও থাকব। গড়গড়িদার আত্মার শান্তি কামনা করি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তিনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন।

ভুলতে পারব না স্বর্ণ যুগের সফল ফুটবল সচিব অজয় শ্রীমানিদাকে। সফল দুই ফুটবল সচিবের পাশাপাশি ভুলতে পারা যাবে না মহম্মদ হাবিবকে। প্রথম পেশাদার ফুটবলার হিসেবে ময়দানে নিজের অস্বিস্তটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন হাবিবদা। দুই ফুটবল সচিবের পাশাপাশি ফুটবলার হাবিবকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সব সময় পূর্বসুরিদের সম্মান করে এবং মনে রাখে। প্রয়াত এই তিনজনকে চিরকাল মনে রাখবে ইস্টবেঙ্গল।

শ্রদ্ধায় স্মরণে...

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অজয় শ্রীমাণি, হাবিব, সুপ্রকাশ গড়গড়িকে নিয়ে স্মরণসভা।

শ্রদ্ধার্ঘ্য ইস্টবেঙ্গল সচিব কল্যাণ মজুমদারের।

সফল দুই ফুটবল সচিব ও সতীর্থ হাবিবকে শেষ শ্রদ্ধা শ্যাম থাপা, তরুণ বসুর।

গুরুকে জানাই প্রণাম। হাবিবকে শ্রদ্ধা শিষ্য প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম ঘোষের

প্রয়াত অজয় শ্রীমানির দুই পুত্র প্রবীর শ্রীমানি ও সুবীর শ্রীমানির হাতে আজীবন সদস্যপদ তুলে দিলেন ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার, কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার। রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক সমরেশ চৌধুরী।

কুয়াদ্রাতের জাদুতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার মোহনবাগানের

অনীক চক্রবর্তী, ক্রীড়া সাংবাদিক, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

ডুরান্ড কাপে গ্রুপ লিগের ম্যাচে মোহনবাগানকে হারানোর পর ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের নিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মাতোয়ারা কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাদ।

১২ই আগস্ট, রবিবার ২০২৩ মহারণ, বড়ো ম্যাচ। হাজার হাজার শব্দ দিয়ে এই ডার্বি ম্যাচকে চিহ্নিত করা হয়। শুধু তিলত্তমা নয়, বা শুধু ভারতবর্ষও না, গোটা পৃথিবীর সমস্ত বাঙালীরা এই দিন দুই ভাগে ভাগ হয়ে টিভির পর্দার সামনে বসে পড়েন। বিকেল ৪.৪৫, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন গমগম করছে। দিন শেষের হাসি কার কেউ জানে না। তবে আবেগ, ভালোবাসার কোনও খামতি নেই।

৯০ মিনিটের শেষে বাঁশি বাজা পর্যন্ত এই লড়াই ছাড়া যাবে না একথা জেনে গিয়েছেন মিস্টার কুয়াদ্রাত। তবে তিনি যে গঙ্গা পারের এই ক্লাবের জন্য এই পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন তা হয়তো অনেকেই জানতেন না।

ম্যাচ শুরু। বিপক্ষে কে নেই? কাকে ছেড়ে কাকে দর্শকরা দেখবেন, আর কাকে ছেড়ে কাকে খাবরা-সৌভিকরা আটকাবে। ভারতীয় জাতীয় দলের মনবীর সিং টু লিস্টন কোথায় তারা? না তাদের আর দেখা যাচ্ছে না।

মিস্টার কার্লোসের চক্রভূয়ে বন্দী এক একটা মোহনবাগান ফুটবলার। প্রথমার্ধ শেষ। ফলাফল ০-০। লাল-হলুদ-এর বিপক্ষ গ্যালারি থেকে অনবরত আওয়াজ এসেই যাচ্ছে। আর আসবে নাই বা কেন? টানা আটটা ডার্বি জেতার এক আত্মতুষ্টি।

শুরু দ্বিতীয়ার্ধ, এবার আর চক্রভূয় না, ভীষ্মের ত্রিশূল ভূয়ের ন্যায় একের পর এক আক্রমণ কুয়াদ্রাতের ছেলেদের। ৬০ মিনিটে নন্দকুমার হিরো। বহু লাঞ্ছনার উত্তর তিনি একাই দিয়ে দিলেন। কেঁপে উঠল পড়শি ক্লাবের জাল। গো...ল...ল ...ল। মশালের আগুনে পুড়তে শুরু করেছে নৌকার পাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জোড়া পরিবর্তন পড়শি পাড়ার ক্লাবের। তাদের জোড়া তরোয়াল মাঠে নামালেন কোচ জুয়ান। কিন্তু আবারও চক্রভূয় তৈরী করে ফেলেন ইস্টবেঙ্গল জনতার এটাই তো আব্দার ছিল লাল-হলুদ সদস্য সমর্থকদের ম্যাজেসিয়ানের ছেলেরা। ম্যাচে আর ফেরা হল না পড়শি পাড়ার ছেলেদের।

শেষ বাঁশির আওয়াজের সাথে সাথে 'জয় ইস্টবেঙ্গল' ধ্বনিতে কেঁপে উঠল গোটা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। গমগম করছে লাল-হলুদ বাঘেদের হুঙ্কার।

গোটা কলকাতায় তখন বৃষ্টি। ভাসছে মহানগরী। তারই মধ্যে বুক চিতিয়ে যুবভারতীর সবুজ গালিচায় দাঁড়িয়ে মিস্টার কুয়াদ্রাত এন্ড কোং। তখন আর তিনি কোচ বা ম্যাজেসিয়ন নন। তিনি হয়ে উঠেছেন ইস্টবেঙ্গলের ত্রাতা। এটাই তো চেয়েছিলেন আপামর লাল-হলুদ সদস্য-সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্দরের পরিবেশ তখন ঠিক কি তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু একটাই কথা বোঝা গিয়েছে।

''উই আর ব্যাক'', ''ইস্টবেঙ্গল ইস ব্যাক''।

এটাই তো আব্দার ছিল লাল-হলুদ সদস্য-সমর্থকদের।

''আমরা কারা-ইস্টবেঙ্গল, তোমরা কারা— ইস্টবেঙ্গল''। দীর্ঘ সারে চার বছরের বেশি সময় পর ফুটবলের মক্কা যেন গমগম করছে এই একটাই স্লোগানে। তিলত্তমার রেঙে উঠেছে লাল-হলুদ রঙে। আজ সবার একটাই পরিচয়, ইস্টবেঙ্গল।

ইতিহাস সাক্ষী ছিল যে যে সময় লাল-হলুদ ব্রিগেড পিছিয়ে পড়ে মাঠে নেমেছে, জয় ছিনিয়ে নিয়েই মাঠ ছেড়েছে তারা। হিন্দিতে একটা কথা আছে, ''ঘায়েল হুয়া সের, জাঙ্গল কা সব সে খাতারনাক হোতা হ্যে''। হ্যাঁ ইস্টবেঙ্গল ঠিক তাই, ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে ডুরান্ড ডার্বি ছিল ''যদি লাল-হলুদ ব্রিগেড ১ পয়েন্ট নিয়েও মাঠ ছাড়ে তা হলেই ইস্টবেঙ্গলের জয়''।

এই কথাটাই হয়তো বর্তমান লাল-হলুদ হেড কোচের সবচাইতে মনে লেগেছিল। তাই ১ নয় লক্ষ্য ৩ নিয়েই মহেশ-খাবরাদের অনুশীলন করিয়েছিলেন স্প্যানিশ বস। তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে পা দেওয়া মাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ঠিক কী দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ফেলেছেন। লক্ষাধিক স্বপ্নের দায়িত্ব যে তারা কাধে। এ কথা বুঝতে তার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নি। কলকাতা বিমানবন্দরে তখন ঠিক দুটি আওয়াজ ''কার্লোস ... কার্লোস'' এবং 'স্যার উই ওয়ান্ট ডার্বি''। প্রথমটা ওয়েলকাম চ্যান্ট হলেও দ্বিতীয়টা যে কতটা মনের ভেতর থেকে আসা একটা আর্জি সেটা তিকিতাকা ফুটবলের স্রোষ্টা দেশের মানুষটা বুঝতে বেশি সময় নেননি।

এরপর কলকাতা লিগের ম্যাচ দেখতে ঘরের মাঠে এলেও সেই একই উন্মাদনা ও ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। আর সমর্থকদের একটাই আবেদন ''উই ওয়ান্ট ডার্বি স্যার''। হয়তো এতদিনে তিনি ভালোই বুঝেছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগ, ভালোবাসা, বুঝেছেন স্প্যানিশ কোচ। তাই তিনি বার বার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি আছেন।

ইস্টবেঙ্গল বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২-২৩

ইস্টবেঙ্গল বার্ষিক সাধারণ সভা মঞ্চে ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার সহ সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় চ্যাটার্জি, কার্যকরি কমিটির সদস্য ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবু সমাজদার, সদানন্দ মুখার্জি। সাধারণ সভায় বক্তব্য পেশ করছেন কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

সমাচার প্রতিবেদন : ২০২২-২০২৩ এর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হল। ২৭ সেপ্টেম্বর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে মিডিয়া রুমে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় হাজির ছিলেন ক্লাব সদস্যরা। আগামীদিনে ক্লাবে উন্নতির জন্য বেশ কয়েকজন সদস্য তাদের মতামত জানান। বার্ষিক সভার শুরুতে ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার সারাবছরের কাজকর্মের কথা সদস্যদের জানান। এছাড়া ২০২২-২০২৩ মরশুমের আয়-ব্যয়ের হিসাবও পেশ করেন সদস্যদের কাছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখে সদস্যরা খুশি। তাই খুব শান্তিপূর্ণভাবেই বার্ষিক সাধারণসভা শেষ হয় ঘন্টাখানিকের মধ্যে। ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার বলেন, গত বছর ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দল কন্যাশ্রী কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি প্রথমবার অনুষ্ঠিত আইএফএ শিল্ডেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তাই মহিলা ফুটবল দলকে অভিনন্দন। শুধু মহিলা ফুটবল দলই নয়, ক্রিকেট, হকি এবং অ্যাথলেটিক্স মিটেও সাফল্য পেয়েছে। শুধুমাত্র গত কয়েকবছর ছেলেদের ফুটবলে আশানুরূপ ফলাফল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। তবে নতুন মরশুমে কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাদের কোচিংয়ে দল সাফল্য পাবে বলে আশাবাদী। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার বলেন, ক্লাব চালাতে গেলে বর্তমানে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আইএসএলএ একটা দল প্রায় সত্তর কোটি টাকা দিয়ে দল গড়ছে। সেখানে আমরা অনেক কম অর্থের বিনিময়ে দল গড়ছি। প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে টক্কর দিতে হলে অর্থের প্রয়োজন। তাই আমরা স্কাউড ফান্ডিংয়ের জন্য জেলায় জেলায় হাজির হওয়ার পাশাপাশি সদস্যদের কাছেও সাহায্য চাইছি। একজন সদস্য ক্লাবের আর্কাইভে মোহনবাগানকে ৭৫ সালে আইএফশিল্ডে পাঁচ গোলের ফলকে তারিখ উল্লেখ করার কথা জানান। বার্ষিক সাধারণ সভার মঞ্চে হাজির ছিলেন ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদার, সহ সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় চ্যাটার্জী, কার্যকরি কমিটি সদস্য দেবব্রত সরকার, ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবু সমাজদার এবং সদানন্দ মুখার্জি। বার্ষিক সাধারণ সভার শেষে মিষ্টি মুখ করার পাশা পাশি হাসি মুখে বাড়ি ফেরেন সদস্যরা।

ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের মানবিকতার নজির

সদ্য প্রয়াত মহামেডান ক্লাব সমর্থক সিরাজউদ্দিনের পরিবারের পাশে দাঁড়াল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। মহামেডান খিদিরপুর ম্যাচের শেষে প্রয়াত সিয়াজউদ্দিনের পুত্রের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন ইস্টবেঙ্গল কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার। রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, মহামেডান কর্তা কামারুদ্দিন।

ক্রিকেট দলের পরামর্শদাতা সন্দীপ পাটিল

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেটের উন্নতি লক্ষ্য শ্রাচি গ্রুপের

সমাচার প্রতিবেদন :বিখ্যাত শ্রাচি গ্রুপের সঙ্গে মেল বন্ধন শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের। ২ অক্টোবর মহাত্মাগান্ধীর জন্মদিনের দিন মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলের স্পনসর হিসেবে সংযুক্ত করণ হল শ্রাচি গ্রুপের। আগামী তিন বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট দলের স্পনসর হিসেবে থাকবে শ্রাচি গ্রুপ। সংযুক্তিকরণ মঞ্চে হাজির ছিলেন শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি, ইস্টবেঙ্গল সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত, সচিব কল্যাণ মজুমদার। চুক্তি সম্পর্কিত সই সাবুদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর শ্রাচি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি বলেন, আমার বাবা ইস্টবেঙ্গলের সদস্য ছিলেন, আমি নিজেও লাল-হলুদের সমর্থক। ছোট থেকেই আমার ক্রিকেট হচ্ছে প্যাশন। আর তাই ইস্টবেঙ্গলের মতো শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভালো লাগছে। হয়তো আপাতত তিন বছরের চুক্তি। কিন্তু এই সম্পর্ক চিরকালের। শুধু ক্রিকেট দল গড়াই নয়, আমাদের মূল লক্ষ্য ক্রিকেট ডেভলপমেন্ট করা। একটা আবাসিক ক্রিকেট স্কুল তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকি মহিলা ক্রিকেট দল গড়ারও পবিকল্পনা রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত বলেন, বাংলা ক্লাব ক্রিকেটে শ্রাচি গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্তি করার দিনটি হল ঐতিহাসিক। ইস্টবেঙ্গল এবং শ্রাচি গ্রুপ এক সাথে পথ চলাতে বাংলা তথা ভারতীয় ক্রিকেটে প্রচুর উন্নতি হবে বলে আমরা ধারণা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার বলেন, বহুদিন ধরে আমরা ভাবছিলাম ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটকেও একটা উচ্চতা নিয়ে যাওয়ার। আমি আশাবাদী শ্রাচি গ্রুপের সাথে সংযুক্তিকরণের ফলে বাংলা ক্রিকেটের পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট তথা আইপিএল ক্রিকেট টুর্নামেন্টও সমৃদ্ধি হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার প্রয়াত শ্রবণ টোডির ছবিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংযুক্তিকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রাচি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি ছাড়া অন্যান্য আধিকারিকগণ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি প্রণব দাশগুপ্ত, সচিব কল্যাণ মজুমদার ছাড়া হাজির ছিলেন সহ সচিব রূপক সাহা, ক্রিকেট সচিব মানস রায়, ফুটবল সৈকত গাঙ্গুলী, কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, রজত গুহ, সদানন্দ মুখার্জি, সুমন দাশগুপ্ত সহ আরও অনেকে। হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তরুণ দে, প্রশান্ত ব্যানার্জি, অলোক মুখার্জি, মিহির বসু, বিকাশ পাঁজি, ফাল্গুনী দত্ত, প্রাক্তন দুই ক্রিকেটার শরদিন্দু মুখার্জি এবং রণদেব বসু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৮৩'র বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম দসদ্য সন্দীপ পাটিল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়িকা ঝুলন গোস্বামী। ছিলেন সিএবির বর্তমান সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলী, প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। উপস্থিত ছিলেন নতুন মরশুমের ইস্টবেঙ্গল দলের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি মেন্টর সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যা ও কোচ আব্দুল মুনায়েম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চিনে অনুষ্ঠিত সদ্য সমাপ্ত সোনা জয়ী ভারতীয় মহিলা দলের বোলিং কোচ রাজীব দত্ত।

শ্রাচি গ্রুপের প্রয়াত কর্ণধার শ্রবণ টোডিকে শ্রদ্ধা পুত্র রাহুল টোডির। রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলে সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত, কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাটিল, বাংলার রঞ্জি জয়ী দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরন বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্য এশিয়ান গেমস সোনা জয়ী ভারতীয় দলের বোলিং কোচ রাজীব দত্ত।

ইস্টবেঙ্গলের ক্রিকেট দলের পরামর্শ দাতা হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হন ৮৩'র বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য সন্দীপ পাটিল। দায়িত্ব পেয়ে আপ্লুত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাটিল। তিনি বলেন, প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়া একবার তাকে বাংলা ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। একই সময়ে ভারতীয় বোর্ড সভাপতি শশাঙ্ক মনোহর তাঁকে এনসিএ-র দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সেদিন ইছা থাকলেও বাংলার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার তাই শ্রাচির কর্তাদের প্রস্তাবে ইস্টবেঙ্গল দলের ক্রিকেট প্রজেক্টের পরামর্শ দাতা হিসেবে সম্মতি দিলাম। সিএবি'র সভাপতি স্নেহাশিষ গাঙ্গুলী আগামী মরশুমে ৮টি দল নিয়ে মহিলা ক্রিকেট শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ছাড়াও একদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে সিএবি। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করবে। কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে প্রাক্তন মহিলা ভারতীয় দলের অধিনায়িকা ঝুলন গোস্বামীকে। অনুষ্ঠান মঞ্চে ঝুলন গোস্বামী ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন। শ্রাচি গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্তি করণের মঞ্চে ৮৩'র বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য সন্দীপ পাটিলের হাতে ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষের স্মারক তুলে দেন ক্লাব সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত, সিএবির সভাপতি স্নেহাশিষ গাঙ্গুলী এবং শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি। শুধু শতবর্ষের স্মারক তুলে দেওয়াই নয়, সন্দীপ পাটিলের হাতে ইস্টবেঙ্গলের আজীবন সদস্যপদ তুলে দেওয়া হয়। সন্দীপ পাটিলের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের আজীবন সদস্য পদ তুলে দেওয়া হয় প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়িকা ঝুলন গোস্বামীর হাতেও। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচায। মধ্য কলকাতার পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত সংযুক্তি করণ অনুষ্ঠানটি ঘিরে ছিল চাঁদের হাট।

চুক্তি সম্পন্ন অনুষ্ঠানের আগে দর্শকাসনে বসে রয়েছেন শ্রাচি গ্রুপের কর্ণধার রাহুল টোডি, রয়েছেন ইস্টবেঙ্গল সভাপতি ডাঃ প্রণব দাশগুপ্ত সচিব কল্যাণ মজুমদার, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাটিল, ঝুলন গোস্বামী, বাংলার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরন ব্যানার্জি, নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল কোচ আবদুল মুনায়েম সহ ক্রিকেটাররা।

এশিয়ান গেমস ২০২৩

ভারতের সর্বোচ্চ পদক জয় ১০৭টি

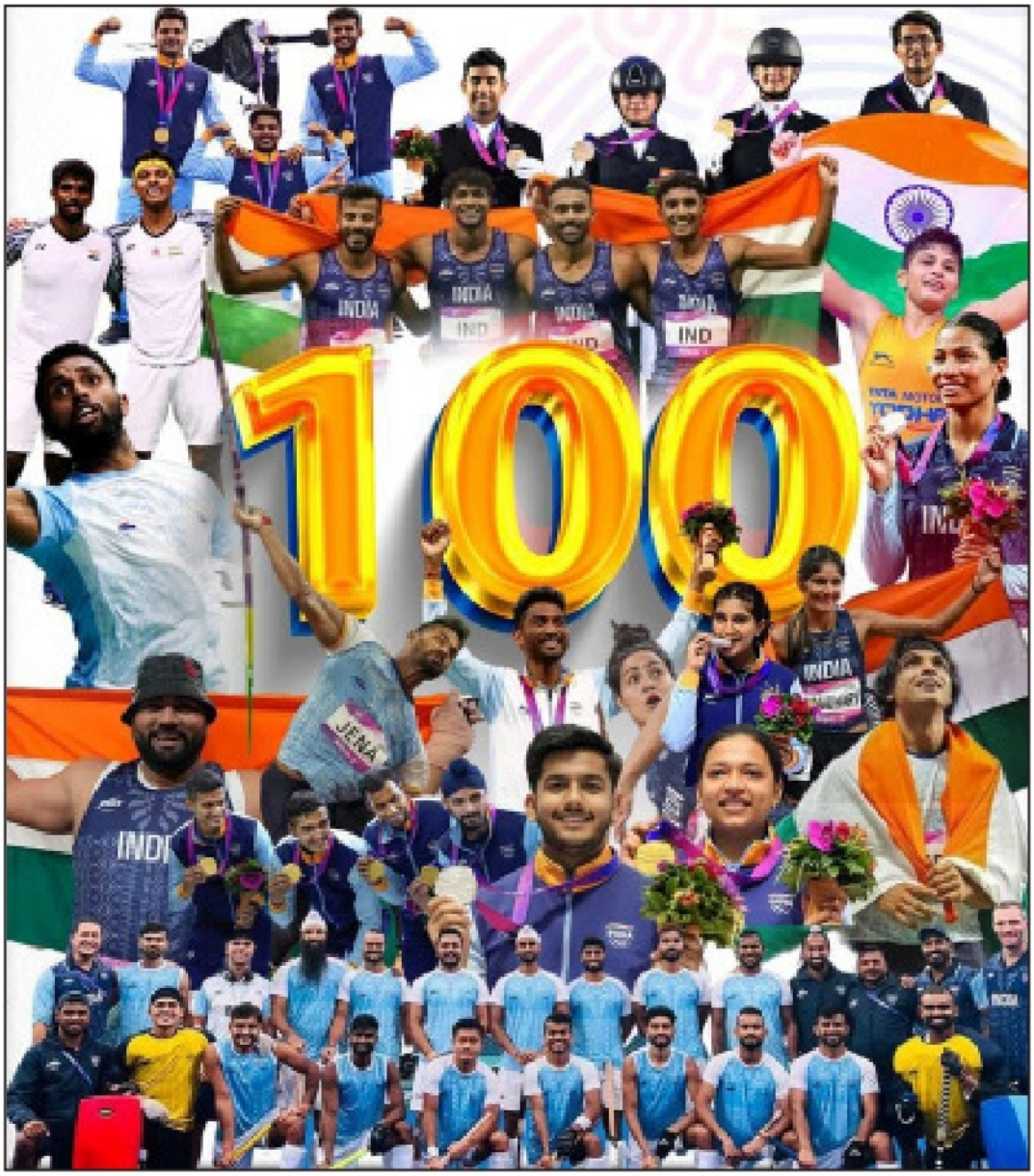

ট্যাকল করতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শরণাপন্ন

টিঙ্কু দে, ক্রীড়া সাংবাদিক

প্রদীপ ব্যানার্জির কোচিং আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে 'গুরু' পিকের মুখে সবিস্তারে শুনেছিলাম গল্পটা।

দুর্গাপুজোর সময়ে একবার রোভার্স কাপ খেলতে আসা মহম্মদ হাবিবের সঙ্গে বসে জুহুর অষ্টমীর ভোগ শুধু খাবেন বলে আশা ভোঁসলেকে নিয়ে কট্টর ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার আর ডি বর্মন ঝাড়া এক ঘণ্টা প্যান্ডেলে অপেক্ষা করেছিলেন। সত্তরের দশকের গোড়ার দিক সেটা।

ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের নিয়মানুবর্তিতার শেষ কথা বড়েমিঞা ঘড়ির কাঁটা ধরে বেলা সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ খেয়েছেন বরাবর। পুজোর ভোগ দুপুর দুটোর আগে পরিবেশনের চান্স নেই আগাম খবর পাওয়া ময়দানের নিজাম সেদিন কিছুতেই প্যান্ডেলে আসছিলেন না। শেষমেশ হাবিবের 'পারদীপদা' অনেক সাধ্য-সাধনা করে সদ্যপ্রয়াত হায়দরাবাদি মহাতারকা ফুটবলারকে বলিউডের পুজো প্যান্ডেলে হাজির করেন। আর ডি-আশাও সেদিন হাবিবকে পাশে নিয়ে মায়ের ভোগ খাওয়ার সাধ মিটেছিল।

আরেক প্রয়াত সুপারস্টার ফুটবল ব্যক্তিত্ব সুভাষ ভৌমিকের আত্মজীবনী 'গোল' লেখার সময় তাঁর কাছে 'অফ দ্য রেকর্ড' গল্প শুনেছিলাম। কীভাবে একবার পুজোর সময় ডুরান্ড কাপ খেলতে গিয়ে কোচ পিকের চোখ এড়িয়ে তাঁরা কয়েকজন লাল-হলুদ ফুটবলার রাত পর্যন্ত দিল্লির দুর্গার প্যান্ডেল-হপিং চালিয়েছিলেন। আর তাতে কী বিপত্তি! ওই সত্তরের দশকেরই ঘটনা।

শুধু চিত্তরঞ্জন পার্ক অঞ্চলেই নাকি সে সময় এতগুলো দুর্গাপুজো হতো, যা বোধহয় এখনও কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের আশপাশ জুড়ে দেখা যায় না। পিন্টু চৌধুরী তো দিল্লির পরপর পাঁচ-ছ'টা পুজো প্যান্ডেলের প্রতিটায় বসে সেই সন্ধ্যে থেকে রাত খিচুরি প্রসাদ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুভাষ-গৌতম-সুবীর-অশোকলাল-শ্যামল ঘোষেরাও খাননি তা নয়। কিন্তু সমরেশের ধারেকাছে নয়। নিট ফল? টিম হোটেলে ফিরে সারারাত বমি আর বাথরুমে ছোটাছুটি পিন্টুর। যে হট্টগোলে প্রদীপ ব্যানার্জির ঘুম ভেঙে যায়। আর কোচ পিকে'র কাছে বামাল সতেম ধরা পড়া শুধু পিন্টু চৌধুরী একা নয়। বাকি 'অপরাধীরাও'! পিন্টু পেটখারাপে শয্যাশায়ী হওয়ায় পিকে'র বকুনি খাওয়া থেকে বেঁচে গেলেও সুভাষ ভৌমিকরা প্রচুর গালাগাল খেয়েছিলেন সেদিন পিকে'র। ঠাকুর দেখার আনন্দ সব মাটি সুভাষ-সুধীর-সুরজিৎদের।

যদিও এর কোনওটাই দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে ব্যারেটোকে 'ট্যাকল' করতে আমার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শরণাপন্ন হওয়ার কাছে কিছু নয়!

বিপিন পাল রোডের 'মাতৃ-মন্দির'র প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন বারোয়ারি দুর্গাপুজো আমার পাড়ার পুজো। তার চেয়েও অনেক বেশি করে বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা বিপ্লব চ্যাটার্জির পুজো বলে জনপ্রিয়, গত চার দশক ধরে। তো ২০০২ সালের গোড়ায় মুম্বইয়ে আমার বিখ্যাত পুরনো সংবাদপত্রের হয়ে ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ানডে ম্যাচ কভার করতে গিয়ে স্ট্র্যান্ড হোটেলে উঠেছিলাম। ওই সময় ওই হোটেলে মোহনবাগান টিম উঠেছিল জাতীয় লিগের ম্যাচ খেলতে মুম্বই এসে। যে ক'দিন ছিলাম, রোজ সন্ধ্যায় দেখতাম ব্যারেটোকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওঁর সিঙ্গল রুমের খাটে বসে বাইবেল পরতে। মাঠের অত দাপুটে ফুটবলার কী ধর্মভীরু আর শান্ত। ভালো আলাপও হয়ে গিয়েছিল ওই ক'দিনে। তখনই ভেবেছিলাম, এ বছরের পাড়ার দুর্গাপুজোয় যদি ব্যারেটোকে প্রধান অতিথি করে নিয়ে যাওয়া যায়।

বিপ্লব চ্যাটার্জির বিস্তর যোগাযোগ আর প্রয়াত মোহনবাগান সচিব অঞ্জন মিত্রের প্রচুর সাহায্যে ব্যারেটো মহাষ্টমীর বিকেলে সত্যিই 'মাতৃ-মন্দিরে'র পুজো প্যান্ডেলে হাজির সেবার। স্বভাবতই ভিড়ে ভিড়াক্কার। পূর্ব পরিচয়ের সুবাদে ব্যারেটোকে সেদিন ওখানে দেখভালের দায়িত্ব আমার ঘাড়েই পড়েছিল। আর আমাকে চমকে দিয়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার জানতে চাইলেন, 'ডুর্গা গডেস'-এর দশ হাতে ওগুলো দশটাই কি 'ওয়েপন'? কেন? ওগুলোর কোনটার কী নাম? কী হিস্ট্রি?

আমি তখন টেনশনে ঘেমেনেয়ে প্রায় অস্থির। মনে মনে ছোটবেলা থেকে শুনে আসা মহালয়ার ভোরে 'দুর্গতিনাশিনী' অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অমর পাঠের সেই পার্টিকুলার জায়গাটা মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। যেখানে দুর্গার দশ হাতে দশ শক্তির অনন্য বর্ণনা করেছেন ভদ্রবাবু। ভাগ্যিস ব্যারেটো ভাঙা-ভাঙা ইংরেজির বেশি বলতে এবং বুঝতে পারতেন না। সেই সুযোগ নিয়ে কোনক্রমে কিছুটা সত্যি কিছুটা গুলতাপ্পি মেরে ব্যারেটোকে বোঝালাম দুর্গা মায়ের দশ হাতের দশ অস্ত্রের কাহিনী।

যার পুরোটাই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের থেকে আমার ধার করা ছিল সেদিন। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের শেষযাত্রার রেডিও-তে ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন ভদ্রবাবু। কিন্তু ফুটবলের সঙ্গে তাঁর শত যোজনেরও বেশি বোধহয় দূরত্ব। যদিও সেদিন ওই মুহূর্তে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে আমার কাছে পিকে-অমল-নঈম-সুভাষ-সুব্রত সবার চেয়ে বড় 'কোচ' ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ব্যারেটোকে সামলাতে আমার পরিত্রাতা।

ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুল

১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে তিনটি বিভাগ চালু হয়। ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি। এক সময় সৌরভ গাঙ্গুলিও ক্রিকেট খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে। ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট দলে খেলেছেন বহু তারকা ক্রিকেটার। তাই নতুন প্রতিভাবান ক্রিকেটার তুলে আনার লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ক্রিকেট স্কুল আকাদেমিতে অনুশীলন চলছে জোর কদমে।

জয়জিৎ মজুমদার

বয়স -১২ বছর
পজিশন - ব্যাটসম্যান
স্কুল - অমৃত বিদ্যালয়
বাড়ি - বেহালা চৌরাস্তা
বাবা - প্রসেনজিৎ মজুমদার
মা - নীলাঞ্জনা মজুমদার

সমাচার প্রতিবেদন : জয়জিৎ মজুমদার। ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট আকাদেমির শিক্ষার্থী। ওর বাবা প্রসেনজিৎ মজুমদার সরকারি চাকুরে। আর মা নীলাঞ্জনা মজুমদার গৃহস্থলী। এক সময় ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছে ছিল প্রসেনজিৎ-এর। কিন্তু পড়াশুনোর চাপে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নপূরণ হয়নি বেহালা চৌরাস্তার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ-এর। আর সে জন্যই নিজে উদ্যোগী হয়ে একমাত্র ছেলে জয়জিৎকে ভর্তি করিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট স্কুলে। বেহালা চৌরাস্তার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ-নীলাঞ্জনার একমাত্র ছেলে জয়জিৎ-এর খুব ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট খেলার প্রতি ঝোঁক। টিভিতে ক্রিকেট দেখার খুব আগ্রহ ছিল ১২ বছর বয়সী ছেলেটির। বাবা প্রসেনজিৎ বলেন, ছোটবেলা থেকেই ওর ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক। এছাড়া খেলাধুলোর প্রতি আমার পরিবারের খুব উৎসাহ ছিল। তাই প্রসেনজিৎকে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে দু'বার ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে কী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরিবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমাদের মতো ছেলেও খুব খুশি, ইস্টবেঙ্গল স্কুল ক্রিকেটের অনুশীলনে নেমে। কোচ শুভ সরকারের কাছে অনুশীলন করে নিজেকে তৈরি করতে প্রস্তুত প্রসেনজিৎ। ওর আদর্শ ক্রিকেটার হলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। প্রায় এক বছর ধরে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলে অনুশীলন করছে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আদর্শ করে বেড়ে ওঠা ১২ বছরের ছেলেটি। অফিসের কাজের চাপে বাবা প্রসেনজিৎ আর মা লীনাঞ্জনা সংসারের দায়িত্ব সামলে মাঝে মধ্যে ছেলেকে নিয়ে অনুশীলনকে আসতে পারেন না। তখন মুশকিল আসান হিসেবে দিদিমা সুতপা উকিল প্রসেনজিৎকে নিয়ে হাজির হন অনুশীলনে। বাবা প্রসেনজিৎ বলেন, কাজের চাপে আমরা স্বামী-স্ত্রী মাঝে মধ্যে অনুশীলনে হাজির হতে পারি না। কিন্তু যখন হাজির হতে পারি তখন অনুশীলন দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। সবচেয়ে বড় কথা লাল-হলুদ কর্তা থেকে কোচেদের আন্তরিকতা ও ব্যবহার কখনও ভোলার নয়। বিশেষ করে মাঠের বাইরে দায়িত্বে থাকা বিশ্বজিৎ দাসের। মাঝে মধ্যে অনুশীলন চলাকালীন গ্যালারিতে বসে দেখতে পাই কতটা সুষ্ঠ পরিবেশ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। এখানে ক্রিকেটের প্রতিটি বিষয় হাতে ধরিয়ে দেখিয়ে দেন কোচেরা। শুধু আমরা নই জয়জিৎও খুশি।

আগামীদিনে ধোনির মতো জয়জিৎ ভারতীয় দলে খেলবে কিনা তা অবশ্য সময়ই বলবে। তবে জয়জিৎ-এর স্বপ্ন সার্থক করার জন্য সরকারী চাকুরে প্রসেনজিৎ ও গৃহস্থলী নীলাঞ্জনা চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই তা কিন্তু বলাই যায়।

রিমি কীর্তনীয়া

বয়স -১৫ বছর
পজিশন - অলরাউন্ডার
স্কুল - কৃষ্ণনগর গর্ভমেন্ট গালর্স স্কুল
শ্রেণি -দশম
বাড়ি - কৃষ্ণনগর নতুন শম্ভুনগর
বাবা - অজিত কীর্তনীয়া
মা - গৌরি কীর্তনীয়া

সমাচার প্রতিবেদন : বাংলায় একটা প্রবাদ আছে-আমি নারী, তাই সব কিছু করতে পারি। আরও একটা প্রবাদ হল যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। তবু মেয়েরা খেলাধুলো করবে এটা অনেকেরই একেবারে না পসন্দ। মেয়েরা ফুটবল কিংবা ক্রিকেট মাঠে নামলেই চারিদিকে গেল গেল রব উঠে যায়। সবচেয়ে বড় কথা সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় চারিদিকে। আর এ সব সমালোচনাকে তোয়াক্কা না করে ক্রিকেট মাঠে নেমে পড়া কৃষ্ণনগর নতুন শম্ভুনগর অঞ্চলের বাসিন্দা রিমি কীর্তনিয়ায়। ১৫ বছর বয়সি একরোখা মেয়ে রিমি কীর্তিনিয়া ছোটবেলা থেকেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলত। বেশ কয়েক বছর পাড়ার মাঠে ক্রিকেট খেলার পর তাঁর বায়না শুরু ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু কৃষ্ণনগর থেকে ইস্টবেঙ্গল মাঠে, এতটা রাস্তা পেরিয়ে অনুশীলনে নামতে হবে। এটা নিয়ে যখন পরিবারের অভিভাবক চিন্তিত, তখন রিমির একরোখা মনোভাব ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। শেষপর্যন্ত ১৫ বছরের একরোখা জেদি মেয়েটির কাছে হার মেনে বাবা অজিত কীর্তনীয়া নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান। হার মেনে বাড়ির ছোট মেয়ে রিমিকে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। নিজে এক সময় কাবাডি খেলতেন। স্বপ্ন দেখতেন খেলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। কিন্তু সংসারের মশাল জ্বালাতে গিয়ে খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন অকালে বিসর্জন দিতে হয় তাঁকে। তাই ছোট মেয়ের ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক দেখে আর অন্য কিছু ভাবেননি । ছোটবেলা থেকেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নাম জানা ছিল তাঁর। তবে জানা ছিল না ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলের কথা। রিমির কাছে হার মেনে জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ের সব কাজ সামলে ছোট মেয়ে রিমিকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে হাজির হন তিনি। দেখা করেন ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলের দায়িত্বে থাকা বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে। বিশ্বজিৎ এর পরামর্শে রিমি ভর্তি হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলে। জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ের সব কাজ সামলে মেয়েকে নিয়ে সপ্তাহে তিন দিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলনে হাজির হন তিনি। রিমি যখন অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে, তখন বাবা অজিতের জায়গা হল ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে। ছোট মেয়ে রিমিকে ঘিরে বহু প্রত্যাশা কৃষ্ণনগর গর্ভমেন্ট কলেজের নৈশ প্রহরী অজিতের। রিমির ব্যাপারে অজিত বলেন, ওর ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ। তাই ওকে ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট স্কুলে ভর্তি করতে দু'বার ভাবিনি। আর এখানকার পরিবেশ এক কথায় দুর্দান্ত। সবচেয়ে বড় কথা ক্রিকেট খেললে শারিরীক ভাবে সুস্থ থাকা যায়। রিমির আদর্শ ক্রিকেটার বিরাট কোহলি এবং স্মৃতি মান্থানা।

East Bengal

A name
that is dedicated
to a lost
motherland.

And people
who are really winners
- continuing to swear
by a game that is
in their blood.

Shyam Sundar Co.
Jewellers

Cheering
for East Bengal Club
Since 1960

Resource Indica

SERUM™

One of the largest Path. Lab in India

স্বাগত হিজাজি মাহের

BATERY

EAST BENGAL CLUB
KOLKATA
সারা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে
লড়াইয়ের একটিই নাম-
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
তাই শতবর্ষ পেরিয়ে গর্বের সাথে
এগিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গল
পঞ্চাশ বছর ধরে সেই লড়াইয়ের
অংশীদার হতে পেরে আমরাও গর্বিত
CELEBRATING
AURIO PHARMA
1972 2022
50 YEARS
GASSANOL
www.auriopharma.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
Indian Bank
এলাহাবাদ
ALLAHABAD
শারদীয়া ও নবরাত্রির
প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
গ্রহণ করুন

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে **মানিক দাসগুপ্ত** কর্তৃক প্রকাশিত এবং **কম্পেড** ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২। e-mail:www.eastbengalclub.com